বাগদাদের
শাহী গল্প

বাগদাদের শাহী গল্প

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯। প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ,
মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
বাবাই-পাপাই প্রেস, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।
প্রচ্ছদ ঃ তাপস কোণার

মূল্য ঃ দশ টাকা

বাগদাদের শাহী গল্প

শচীন দাশ

মডেল পাবলিশিং হাউস

২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

বাগদাদের শাহী গল্প

এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে অনন্ত গল্প; অনন্ত কাহিনী। এইসব গল্প ও কাহিনী কোনোদিনই পুরোণো হয় না। বারবার নতুন হ'য়ে ধরা দেয়। কিশোর-কিশোরীরা যেমন পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যায়, তাদের মা-বাবাও আনন্দে আপ্লুত হয়।
'বাগদাদের শাহী গল্প'—এর আশ্চর্য বুনোটে রয়েছে মন-মাতানো কাহিনীর উপহার। এইসব গল্পে পুরোণো দিনের ধর্ম, সংস্কার ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে রয়েছে অলৌকিকতার মেলবন্ধন। এই মেলবন্ধন গল্পগুলিকে এমন এক অসাধারণত্ব এনে দিয়েছে যার ফলে চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে।

স্নেহের

তিলাঞ্জলিকে

একদিনের বাদশা

অনেকদিন আগে বাগদাদ শহরে একজন নামকরা ধনী সওদাগর বাস করতেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। ছেলের নাম আবু হোসেন। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মার আদরে আদরে মানুষ হয়ে, বয়সকালে আবু তার ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো আর তাদের পেছনে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করা ছাড়া আর কোনো কাজই করত না।

সওদাগর একদিন মারা গেলেন। আর আবুর হাতেও এসে গেল অঢেল ধনসম্পত্তি। এরপর আর তাকে পায় কে? বাবার ব্যবসার দিকে মন না দিয়ে আরো বেশী করে বন্ধুদের ডেকে এনে সেই টাকা পয়সা সমানে ওড়াতে লাগল।

আবুর মা খুব চিন্তায় পড়লেন। ছেলে যদি এভাবে সব ওড়াতে থাকে তাহলে তো দু'দিনেই সব শেষ হয়ে যাবে। তখন আর বাকী জীবনটা চলবে কি করে ওর! আবুর মা তখন করলেন কি, সমস্ত ধনসম্পত্তি রাতারাতি দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ মাটির নীচে পুঁতে রাখলেন। ভাবলেন, একভাগ উড়িয়ে-টুড়িয়ে আবু যখন দেখবে আর কানাকড়িও নেই, বন্ধুরাও সব পালিয়ে গেছে তখন নিশ্চয়ই ঠেকে শিখবে। এমনি বললে তো ছেলে বুঝবে না।

তাই হল! মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাবার অত টাকা যে কোথায় উড়িয়ে দিল আবু নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না। সে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। একটু পরে তার যেসব বন্ধুরা এতদিনের আনন্দ স্ফূর্তির সঙ্গী ছিল, তাদের কাছে পরামর্শের জন্য গেল। কিন্তু বন্ধুরা তাকে আসতে দেখেই সরে পড়ল। বন্ধুদের ব্যবহারে আবু হতাশ হল। এতদিনে চোখ খুলল তার।

আবুর মা বুঝতে পেরেছিলেন আবুর অনুশোচনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে বাকী অর্ধেক ধন-সম্পত্তি মাটির নিচ থেকে তুলে এনে আবুর হাতে দিয়ে বললেন, এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেওয়ার জন্য।

আবু তাই করল। পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ডুবে রইল আর রোজই সন্ধ্যের পরে শহরের বড় রাস্তার ধারে গিয়ে বসে থাকত সে, নতুন নতুন বিদেশী মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য। রোজই একজন না একজন বিদেশী মানুষকে খাতির-যত্ন করে ঘরে আনত সে। তারপর সারারাত তার সঙ্গে আমোদ স্ফূর্তি করে পরেরদিন সকালে বিদায় দিত তাকে।

একদিন এমন করতে গিয়েই বিপদ বাধল।

সে সময়ে বাগদাদের বাদশা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ। খুব নাম ডাক ছিল তাঁর। যেমন মানুষ হিসেবে সৎ তেমনি শাসক হিসাবে ছিলেন অতুলনীয় আর সুবিচারক। মন ছিল তাঁর দয়ায় ভরা। তাঁর প্রজারা কে কেমন ভাবে বাস করছে, আর তাদের সুবিধে-অসুবিধে কি কি—তা জানার জন্য নিজে রোজ রাতে ছদ্মবেশে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। এক একদিন এক এক রকম ছদ্মবেশ নিতেন তিনি। আর সঙ্গে থাকত অত্যন্ত বিশ্বাসী একজন উজীর।

এক রাত্রে এক বিদেশী সওদাগরের ছদ্মবেশ পরে হারুণ-অল-রসিদ যখন শহরের বড় রাস্তায় এসে উঠেছেন, সেই সময় তাঁকে দেখে আবু হোসেন এগিয়ে গেল। বলল, জনাব—আপনাকে দেখে একজন বিদেশী সওদাগর বলেই মনে হচ্ছে। যাইহোক মেহেরবান করে যদি আজ রাতটা আমার গরীবখানায় থেকে যান তবে ভীষণ খুশী হই।

—গরীবখানা। কে কে আছে সেখানে তোমার?

—আজ্ঞে আমার মা আর আমি। এই নিয়েই আমার সংসার। যদি যান সেখানে—

কে এই লোকটা? কেনই বা সে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইছে! জানার জন্য মনে মনে ছটফট করে উঠলেন বাদশা হারুণ-অল-রসিদ। তিনি রাজি হয়ে গেলেন তার বাড়িতে যেতে।

সহজ সরল আমুদে ছেলে আবু হোসেনের সঙ্গে মেতে বাদশা ভারি খুশী হলেন। বাদশার আসার খবর পেয়ে আবুর মা অনেক ভাল ভাল খাবার তৈরী করে তাঁকে খাওয়ালেন। ভালো খাবার

বাদশা জীবনে অনেকেই খেয়েছেন, কিন্তু এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।
বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাদশা একসময় কথায় কথায় আবুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হতে ইচ্ছে করে বল তো?'
আবু বলে, আমার তিন-চারজন বাজে বন্ধু আছে। তারা আমার নামে নিন্দা করে বেড়ায়। তাদের জব্দ করার জন্য একদিনের মতোও যদি বাগদাদের বাদশা হতে পারতাম, তবে দেখিয়ে দিতাম কত ধানে কত চাল।
আবুর কথা শুনে বাদশা মনে মনে হাসলেন। শুধু তাই নয়। আর তখনই ঘটল আসল ঘটনা।
টেবিলে তিনজনের জন্য সরবত দেওয়া হয়েছিল। আবু একটু চোখের আড়াল হতেই বাদশা তার পোশাকের ভেতর থেকে কি একটা ঔষধ বার করে আবুর গ্লাসে ঢেলে দিলেন। একটু পরে তিনজনই শরবত খেতে শুরু করলে আবু ঘুমে ঢলে পড়ল।
বাদশা তখন উজীরকে হুকুম করলেন, আবুকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যেতে। নিয়ে যেন তাঁরই বিছানায় ওকে শুইয়ে দেওয়া হয়।
উজীর তাই করলেন। আবুকে বাদশার প্রাসাদে নিয়ে তার পোষাক খুলে, বাদশারই গায়ের ঝলঝলে পোষাক পরিয়ে শুইয়ে দিলেন বাদশার বিছানায়। এমন কি বাদশা সবাইকে বলে দিলেন, আবু সকালে ঘুম থেকে উঠলে সবাই যেন আবুকে বাদশার মতই ব্যবহার করে।
পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবুর তো চোখ কপালে ওঠে আর কি! এ কোথায় এল সে? এ তো তার নিজের বাড়ী, নিজের বিছানা নয়! তাছাড়া ওর গায়েই বা এত দামী পোষাক এল কি

করে ? এ যে একেবারে বাদশার পোষাক ! অথচ কাল রাতেও সে ছিল এক সওদাগরের ছেলে—শহরের একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল যে সকাল হতেই সে একেবারে বাগদাদের বাদশা।

আবু চোখ খুলতেই সবাই তাকে খুব খাতির যত্ন করছিল। খানিকক্ষণ ব্যাপারটা দেখে সে একজন বান্দাকে ডেকে বলল, ওহে শোনো— ! বলতে পারো আমি জেগে আছি, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি ?

বান্দাটি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুর্ণিশ করে জিভ কেটে বলল, একি বলছেন জনাব। খোয়াব দেখবেন কেন আপনি ? আপনি তো জেগেই আছেন। উঠুন জনাব—উঠে মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা করে; পোষাক পাল্টে নিন। এক্ষুণি তো আবার দরবারে যেতে হবে খোদাবন্দ !

বাদশার ঘুম ভাঙাবার জন্য প্রাসাদে সব সময়ই একদল নর্তকী থাকে। আবুর জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল। তারা এসে আবুর ঘুম ভাঙিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আবু তাদেরই এক জনকে ডেকে বলল, শোনো হে—খুব নাচ দেখিয়ে তো আমার ঘুম ভাঙালে। কিন্তু বল তো আমি কে?

—কে আবার! নর্তকী খুব ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি তো জনাব আমাদের খোদা মেহেরবান হুজুর। তামাম দুনিয়ার বাদশা হারুণ-অল-রসিদ।

শুনে আবুরই মাথা ঘুরে যায় আরকি! কিন্তু ব্যাপারটা কি কিছুতেই ভেবে বার করতে পারল না। তবুও আবু গালে হাত রেখে ভাবতে লাগল।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর ভাবতে পারল না। তার আগেই ওরা আবুকে বিছানা থেকে তুলে, হাত মুখ ধুইয়ে, নাস্তা করিয়ে পোষাক পাল্টে দরবারে পাঠিয়ে দিল।

দরবারে আবুকে দেখেই উজীর নাজীর থেকে আমীর ওমরাহ আর সিপাই সেনারা সকলেই কুর্ণিশ করতে লাগল। আবু বসল এর পর বাদশা হারুণ-অল-রসিদের জাঁকজমকপূর্ণ সেই বিখ্যাত সিংহাসনে। এবার যেন নিজেকে তার বাদশা বলে মনে হতে লাগল।

একটু পরে আবু হঠাৎ সিপাই সেনাদের দিকে তাকিয়ে বলল, যাও জলদি যাও সেই তিনজন লোককে এখুনি ধরে নিয়ে এস। তারপর আমার সামনে একশো ঘা করে চাবুক লাগাও ওদের। এই তিনজন লোক হল আবুর সেই তিন বদমাইস বন্ধু। যারা সুযোগ পেলেই আবুর নামে বদনাম রটিয়ে বেড়াত।

কিন্তু সিপাই-সেনারা তো আর তাদের কথা জানত না; তাই আবুর দিকে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে উজীর এবার জিজ্ঞেস করলেন আবুকে, কোন তিনজন লোক জনাব?

আবু তখন তাদের নাম ঠিকানা জানাতেই সিপাই-সেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে আনল তাদের। আবুর সামনেই তাদের প্রত্যেককে একশ ঘা করে বেত মারা হল।

আবু এবার তার নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল; ও বাড়িতে আবু হোসেন নামে একটা লোক থাকে। তার বিধবা মাকে এক্ষুণি গিয়ে এক হাজার মোহর দান করে এসো।

আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। আর এমনি করে এক সময় দরবারও শেষ হল। আবুকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদে। সেখানে বাকি দিনটা চলল নাচ গান খাওয়া দাওয়া আর আমোদ স্ফূর্তি। মনে মনে বেশ ভালই লাগছিল আবুর। ভাবছিল, এসব যেন শেষ হয় না আর কোনোদিন।

কিন্তু তা কি আর হয়! দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে হয়ে এক সময় রাত গভীর হয়ে উঠল। একজন নর্তকী এসে আবুর সামনে শরবতের পাত্র ধরে দাঁড়াল। আবু নিঃশেষে সেই পাত্রের সবটুকু সরবত পান করে পাত্রটা ফিরিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অবাক কাণ্ড। একটু একটু করে ঘুমের ভেতরে ডুবে গেল আবু। তা তো হবেই। আসলে ওই পাত্রে সরবতের সঙ্গে আবার সেই ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন হারুণ-অল-রসিদ।

আবু ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। এতক্ষণ সারাদিন ধরে আড়ালে থেকে শুধু মজাই

উপভোগ করছিলেন। এবার আবু ঘুমোলে উজীরকে বললেন, ওর গায়ের পোশাক খুলে, পুরনো জামা-কাপড় পরিয়ে ওকে আবার ওর বাড়িতেই রেখে এসো।
উজীর সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই আবু অবাক! কোথায় সেই প্রাসাদ! কোথায় সেই নর্তকী আর নাজীর-উজীর, আমীর-ওমরাহের দল। এ তো তার নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায়ই শুয়ে আছে। তাহলে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল নাকি?
টের পেয়ে আবুর মা ছুটে এলেন। বললেন, কি রে কাল কোথায় ছিলি তুই! আমি তো ভেবে ভেবেই মরি। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে। কাল সকালের দিকে বাদশার লোকজন এসে আমাকে একহাজার মোহর দান করে গেছে। কি ব্যাপার বল তো!

মোহরের কথা শুনেই আবু বুঝতে পারল—এ তো তার পাঠানো সেই মোহর। তাহলে তো এসব স্বপ্ন নয়! কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এখানেই বা আবার এল কি করে সে! গেলই বা কিভাবে? ভেবে ভেবেও কিছু বার করতে পারল না আবু হোসেন। বিড়বিড় করে তখন শুধু বলতে লাগল—আমি বাগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ।

কথা শুনে সবাই বুঝল, হঠাৎ কোনো কারণে আবুর মাথাটাই বিগড়ে গেছে। দুদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দুদিন কেন; সাতদিনেও যখন সারল না তখন সবাই ধরে নিল; আবু পাগল হয়ে গেছে।

জোর করে একদিন তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হল। কিছুদিন এখানে থাকার পর সুবুদ্ধি ফিরে এল আবুর। স্বাভাবিক হয়ে আবার সে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিল। তবে সন্ধ্যের পর ঘর ছেড়ে বেরোল না। ভাবল, কি জানি আবার কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে আবার তাকে যাদু করে এমনি বিপদে ফেলবে। কেননা ততদিনে আবুর ধারণা হয়েছে; সেই রাত্রের বিদেশী সওদাগর নিশ্চয়ই একজন যাদুকর। তার যাদুতেই আবুর এমন দুরবস্থা হয়েছিল!

কিন্তু কতদিন আর বাড়িতে বসে একাএকা কাটানো যায়। বন্ধুর অভাবে আবুর বুকটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে!

একদিন আর থাকতে না পেরে সন্ধ্যের পরে শহরের বড় রাস্তার ধারে আবার এসে দাঁড়াল আবু। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার সে রাত্রেও বাদশা হারুন-অল-রসিদ সেই বিদেশী সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে আবুর খোঁজখবর নিতেই আসছিলেন। হঠাৎ

দেখতে পেয়ে বাদশা আবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আবু তো বাদশাকে দেখেই রেগে উঠল। চিনতে পারল; সেদিনের সেই বিদেশী সওদাগরকে। কিন্তু আজ আর তাকে ডাকল না আবু। বরং সওদাগর নিজেই কাছে আসতে আবু চেঁচিয়ে উঠল; না—না আপনার সঙ্গে আর কোনো কথা নয় মশাই। আপনি আমার সর্বনাশ করছিলেন। একটুর জন্য বেঁচে গেছি। আজ আবার এসেছেন আমাকে জ্বালাতে। না—না চলে যান—চলে যান আপনি—

বাদশা আবুকে বোঝাতে থাকে; না—না বিশ্বাস কর ভাই আমার কোনো দোষ নেই। তাছাড়া তুমি আমাকে খাতির-যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে অত খাওয়ালে আমোদ-স্ফূর্তি করলে আর আমি কিনা তোমার সর্বনাশ করবো। না—না আবু হোসেন এটা তোমার ভুল ধারণা—। যাই হোক আজ রাতে একটু অন্তত আশ্রয় দাও। আমরা বিদেশী। বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে বিপদে পড়েছি এখন তুমি যদি না দেখো—

বিপদের কথা শুনে মনটা নরম হল আবু হোসেনের। তাইত! বিদেশী পথিক! কোথায়ই বা যাবে এই রাতে—ভাবতে না ভাবতে আবু আবার তাদের সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সেদিনের মত আবার সেই আমোদ-উৎসব। একটু পরে আবুর আড়ালে শরবতের সঙ্গে আবার সেই ঘুমের ওষুধটা মিশিয়ে দিলেন বাদশা। আবু ঘুমিয়ে পড়লে উজীরকে বললেন; আবার আগের মতই আবুকে বাদশার প্রাসাদে নিয়ে যেতে।

উজীর এবারও সেরকম ব্যবস্থাই করল।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হল আবু পরেরদিন। আবার সে বাদশার পোশাক পরে বাদশারই প্রাসাদে শুয়ে আছে। এবার আর বুঝতে তার অসুবিধে হল না, ওই বিদেশী সওদাগরটাই যাদুর সাহায্যে তাকে আবার এখানে এনেছে।

আবু তো ভয়ংকর ক্ষেপে উঠল। ঘুম ভাঙার পর যে সব নর্তকীরা তখনো দাঁড়িয়ে তাকে নাচ দেখাচ্ছিল, তাদের চলে যেতে বলল। আর যে সব বান্দারা তাকে হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করার জন্য 'জনাব' আর 'হুজুর' বলে বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিল, তাদের মুখের ওপরেই বলল, না—না আমি জনাব নই। আমি বাদশা নই। আমি আবু হোসেন। এক সওদাগরের সাধারন এক ছেলে। আমি খোদাবন্দ নই।

নর্তকী আর বান্দারা তবুও ছাড়ার পাত্র নয়। তারাও সমানে হুজুর আর খোদাবন্দ বলে আবুকে বার বার কুর্নিশ করে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

এবার চেঁচিয়ে উঠল আবু হোসেন, না—না আমি খোদাবন্দ নই। আমি আবু হোসেন। কোথায় সেই পাজি বদমাইশ

যাদুকরটা! ওকে পেলে একবার আমি দেখে নেব। বার বার আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি!

আবুর চিৎকারের মধ্যেই আচমকা বাদশা হারুন-অল-রসিদ আড়াল থেকে বেরিয়ে আবুর সামনে দাঁড়াল।

তাঁকে দেখেই আবু তো প্রায় দৌড়ে যায় আর কি! খুব রেগে গিয়ে বলে, এই যে তুমি এসেছো। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এই কে কোথায় আছো—জল্লাদ—জল্লাদ—শিগগির এর গর্দানটা কেটে নাও।

কিন্তু জল্লাদ কেন, কেউই এগিয়ে এল না বাদশার গর্দান নিতে।

বাদশা হারুন-অল-রসিদ তখন মিটমিট করে হাসছেন।

সেই হাসি দেখে আবারও কি বলতে যাচ্ছিল আবু। কিন্তু তার আগেই একজন উজীর আবুর কানে কানে বললেন, আরে আরে করছো কি—কাকে কি বলছো। ইনি কে জানো? ইনিই তো বাদশা, বাগদাদের রোশনী হারুন-অল-রসিদ।

কথাটা শুনেই বাদশার পা দুটো জড়িয়ে ধরল আবু হোসেন। বলল, গোস্তাকী মাপ করবেন হুজুর। আমি না জেনেই বলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

ততক্ষণে আবুকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন বাদশা। বলেছেন, না আবু আমি ক্ষমা করবো কি করে? আমিও তো তোমাকে কম কষ্ট দিইনি। আমার জন্যই তুমি পাগল হয়েছো। পাগলা-গারদে গেছো।

বলতে বলতে ইশারায় একজন খাজাঞ্চিকে ডাকলেন হারুন। ডেকে বললেন রাজ কোষাগার থেকে এখুনি পাঁচ হাজার মোহর নিয়ে আসতে। ওটা তিনি আবুকে বকশিস হিসেবে দেবেন।

আবু বলল; জনাব পাঁচ হাজার মোহরের চেয়ে আপনি যে আমার গরীবখানায় দুরাত্রি গিয়েছিলেন তাতেই আমি ধন্য। মাঝে মাঝে আমি যেন এমনি আপনার দেখা পাই।

বাদশা খুশী হয়ে তাঁর বাগানের এক কোণে সব চেয়ে সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িটা আবুকে দিলেন। আর তাঁর বেগমের নোজাতুল বলে যে সবচেয়ে সুন্দরী সখী ছিল, তার সঙ্গেই আবুর বিয়েটা দিলেন।

তারপর? তারপর আর কি! বিধবা মা ও বউ নোজাতুলকে নিয়ে আবু দিনগুলো ভালই কাটিয়ে দিতে লাগল। সবাই ওদের দেখে খুশী। শুধু খুশী হতে পারল না আবুর সেই তিনজন শয়তান বন্ধু। যারা সুযোগ পেলেই আবুর নামে যাচ্ছেতাই বলে বেড়াত।

এক যাদুকর ও বাগদাদের সেই তরুণ বাবুচি

এক যাদুকর—নানা দেশ ভ্রমণের পর ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁছোল একদিন বাগদাদ শহরে। বাগদাদ তখন দুনিয়ার সেরা এক আজব শহর। কি না পাওয়া যায় সেখানে। হাত বাড়ালেই হাতে উঠে আসে নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস। তাছাড়া কি সুন্দর দেখতে এই শহরটাকে। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস দুটো নদী এসে মিশেছে এখানে। নদীর ওপরে অপরূপ সুন্দর নৌকোর সেতু। তাও আবার একটা দুটো নয়। সাত সাতটা সেতু একসঙ্গে পরস্পর জোড়া দেওয়া। তার ওপর দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করছে। ফূর্তিবাজেরা যাচ্ছে নদীর ধারের ফলবাগান আর ফুলবাগিচায় ফূর্তি করতে।

দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল যাদুকর। সে এসেছিল সন্ধ্যের দিকে। এসেই একটা সরাইখানায় কাটিয়ে দিয়েছিল সারাটা রাত। কিন্তু ভোরে উঠেই গাধার পিঠে চড়ে সেই যে শহরটা দেখতে বেরিয়েছে, দেখে দেখে এখনো পর্যন্ত যেন আশ মিটছে না যাদুকরের। মাঝে মাঝে খিদে পেলে খায়। বাকি সময়টা শুধু শহরটা ঘুরে দেখে।

এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন বাজারের ভেতরে এসে পড়েছিল সে। ঘুরতে ঘুরতে নানা দোকান-পাট দেখছিল। কেনাকাটার দোকান থেকে শুরু করে খাবারের দোকানে পর্যন্ত রকমারী সব জিনিস। খাবারই তো কতরকমের। কাবাব, কোপ্তা, কোর্মা, কালিয়া, পোলাও, বিরিয়ানি থেকে খেজুর, পেস্তা, আখরোট, কিসমিস, পেঁড়া, লাড্ডু ও কতরকম সব কত চেনা-অচেনা খাবার। আর কি তার গন্ধ! রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রাস্তার লোকজনও পর্যন্ত না তাকিয়ে পারে না।

যাদুকরও তাকিয়েছিল এমনি একটা দোকানের দিকে। ভেবেছিল, একবার দাঁড়িয়ে খাবারের রকমফের দেখেই চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ কি নজরে পড়ায় যাদুকরের আর যাওয়া হল না। একটু দাঁড়াতেই তার ততক্ষণে নজরে পড়েছে সেই দোকানের তরুণ বাবুর্চি ছেলেটির দিকে। আহা কি রূপ! চাঁদও যেন হার মানে ওর কাছে। যেমন রূপ তেমনি গায়ের রঙ। তাছাড়া পোশাক-আসাক দেখেও মনে হয় বেশ রুচি আছে। সৌখিন স্বভাবের। কিন্তু এত সব থেকেও ছেলেটির মুখে যেন একটা বিষন্নতার ছাপ। চাঁদের বুকেও যেন কালো ছায়া পড়েছে। কি হয়েছে কি? এত বিষন্ন এত ক্লান্ত কেন ছেলেটির মুখ।

যাদুকরের খুব মায়া হল।
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ছেলেটির নজরে পড়ল যাদুকরকে। দেখেই সে এগিয়ে এল। যাদুকর বলল, সেলাম আলেকুয়াম—
—আলেকুয়াম সেলাম—ছেলেটি তার প্রত্যুত্তর ফিরিয়ে দিল; আসুন জনাব—আসুন—। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে বসুন। তারপর আপনার পছন্দমত খাবারের অর্ডার দিয়ে আপনাকে খাওয়ানোর সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।
কথা তো নয়! যেন মিষ্টি পাখির বুলি। তাছাড়া এমন আন্তরিকভাবে কথাগুলো বলল যে যাদুকর না ঢুকে পারল না। ছেলেটি তাকে একটা সুন্দর জায়গায় বসিয়ে সেই দোকানে বানানো বাগদাদের কিছু সেরা খাবার এনে হাজির করল সেখানে। তারপর তাকে খেতে অনুরোধ করল।
যাদুকর ছেলেটিকে তার পাশে বসতে বলল। ছেলেটি বসলে খেতে খেতে একসময় বলল, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি বেটা। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সুস্থ নও। কি হয়েছে বল তো? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?
যাদুকরের কথায় স্নেহের স্পর্শ পেতেই ছেলেটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরে আস্তে আস্তে বলল; জনাব কি হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লার দোহাই—
যাদুকর একবার তাকাল ছেলেটির দিকে। এবার বলল; তোমার ভালর জন্যই বলছি বেটা। কি হয়েছে আমাকে খুলে বললে আমি বোধহয় তোমার উপকারই করতে পারবো। আল্লার দোয়ায় আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভাল করে তুলতে পারবো। বলো কি অসুখ হয়েছে তোমার?

যাদুকরের কথায় ছেলেটির কি হল কে জানে। চোখদুটো ছলছল করে উঠল। একসময় মুখ নিচু করে বলল সে, জনাব আপনি ঠিকই ধরেছেন। অসুখই করেছে আমার। তবে সে অসুখ আমার শরীরে নয়। মনে।

—ও তাহলে মানসিকভাবে অসুস্থ তুমি ?

—জী হ্যাঁ।

—তাই বল। মনে মনে আমি ঠিকই ধরেছি তাহলে। কিন্তু ব্যাধিটা কি বল তো ভাই ?

ছেলেটি একবার এদিকওদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, মানে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছি। তাকে শাদি করতে চাই। কিন্তু তার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে পারছি না। দেখা করা তো দূরের কথা, তাকে পাওয়া একরকম অসাধ্যই বলতে পারেন। অথচ তার জন্য ভেবে ভেবেই আমার এই দশা।

—কিন্তু কে সেই মেয়েটি ! তার ঠিকানা আমায় দিতে পারো ? তাহলে তোমার জন্য একবার চেষ্টা করি।

—সে কথা তো এই দোকানে বসে বলা যাবে না জনাব। যদি আপনি শুনতে চান তাহলে বেলা পড়লে একবার এখানে আসুন। আমি আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানেই সব খুলে বলব।

যাদুকর তাতেই রাজি হয়ে গেল।

বিকেলে ছেলেটির বাড়িতে গেল যাদুকর। বাবুর্চি ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভালই। বাবা মা আছে। দুজনের কাছ থেকেই অনেক কিছু পেয়েছে সে।

খানিকক্ষণ এটা সেটা নিয়ে কথা বলে বাইরের ঘরে বসল ওরা

দ্বজনে। একটু পরেই খাবার এল। নানা ধরনের খাবারের পাশাপাশি সিরাজিও ছিল। তা পান করার কিছ্বক্ষণ বাদে বাদ্বকরই প্রথম কথা বলল, তাহলে আর দেরী কেন? নাও এবার শ্বর্ব কর তোমার সেই মেয়েটির কথা।

অল্প একটু পরেই ছেলেটি শ্বর্ব করল। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগছিল। খানিকটা পরেই সেসব কাটিয়ে শ্বর্ব করল তার কাহিনী।

বাব্বর্চি ছেলেটি বলতে লাগল, জনাব—আপনি নিশ্চয়ই জানেন না এখানকার এক জাঁদরেল খলিফার কথা। নাম—অল্ মবুতাজিদ বিল্লা। এই খলিফারই এক মেয়ে। পরমাস্বন্দরী। আকাশের

জোছনার মত তার গায়ের রঙ। মুখ তার পূর্ণিমার চাঁদকেও বুঝি হার মানায়। আর কণ্ঠে তার বসে থাকে ফুলবাগিচার হাজার হাজার বুলবুলি। সে যখন কথা বলে, তার সুমিষ্ট ধ্বনির রেশ যেন বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খলিফার মেয়ের এমনি রূপ দেখে কত দেশের কত সুলতান নাজিম, আমির-ওমরাহরা যে খলিফার কাছে তাঁর মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যে-ই এসেছে তাকেই অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দিয়েছে খলিফা। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও ছিল—মেয়ে তাঁর এত আদরের যে তাকে কাছ ছাড়াও করতে পারতেন না খলিফা।

এদিকে খলিফার আদেশ ছিল, প্রতি শুক্রবারে যখন বাজারের ব্যাপারী থেকে শুরু করে কারিগর পর্যন্ত সবাই জুম্মা মসজিদে নমাজ পড়তে যাবে, তখন সবাইকে দোকানপাট খোলা রেখেই মসজিদে যেতে হবে। কেননা খলিফার খুবসুরত সেই বেটি তখন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে অসংখ্য বাঁদীসহ বাজারের দোকান ঘুরে নানা জিনিস দেখে বেড়ায়। এটাওটা পছন্দ করে।

খলিফার মেয়ের রূপের কথা আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু কখনো দেখিনি। মনে মনে ভীষণ ইচ্ছে হত দেখার। এক শুক্রবারে নামাজ পড়তে না গিয়ে আমি বাড়িতে থেকে গেলাম। লুকিয়ে রইলাম ঘরের ভেতরে। ভাবলাম—আজ খলিফার মেয়ে এলে যেভাবেই হোক তাকে দেখতেই হবে।

একটু পরে খলিফার মেয়ে বাজারে এল। সঙ্গে চল্লিশটি বাঁদী সহচরী–তারা প্রত্যেকেই যেন আকাশের এক একটা চাঁদ। আর তারই মাঝখানের মেয়েটি যেন নবোদিত সূর্য। চল্লিশ বাঁদী

সুন্দরীরা ঘিরে চলেছে তাকে। তার পোশাকের একটা দিক সোনার হুকে তুলে ধরেছে—যাতে তাতে একটুও ধুলোবালি না লাগে। মেয়েটিকে দেখেই আমার হয়ে গেল। বিশ্বাস করুন জনাব, মনে হল একেই আমি বহুদিন ধরে খুঁজছি। চোখ থেকে আমার জল পড়তে লাগল। বুকটা মরুভূমির মতই শুকিয়ে উঠল। আর মাথার ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন। আমি আর থাকতে পারলাম না।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল বাবুর্চি ছেলেটি। কান্নাভাঙা গলায়ই বলল, সেই থেকে আমার এমনি অবস্থা। দিনদিন মন ভেঙে যাচ্ছে। তাকে ছাড়া যে এ-মন আর জোড়া লাগবে না জনাব।

এতক্ষণ মন দিয়ে বাবুর্চি ছেলেটির কথা শুনছিল যাদুকর। এবার বলল, হুম—সব তো শুনলাম। আচ্ছা আমি যদি তোমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে? তবে তুমি কী দেবে আমাকে?

—আমার যা কিছু আছে—ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বলল, টাকা-পয়সা ধনসম্পত্তি যা আছে, যা আপনি চান—!

যাদুকর খুশী হয়ে বলল, ঠিক আছে। এবার যা যা বলব আমি সেসব জোগাড় করে আনো দেখি।

ছেলেটি আশা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ বলুন জনাব কি কি আনতে হবে আমাকে।

যাদুকর বলল; একটা ধাতুপাত্র। সাতটা সূঁচ। টাটকা লুওয়াহু, এক টুকরো রাঁধা মাংস, খানিকটা ঘন কাদা, ভেঁড়ার কাঁধের হাড়, কিছুটা পশমের কাপড় ও সাতরকমের রেশমী কাপড়।

ছেলেটি সেসব এনে দিলে যাদুকর তাতে কিসব মন্ত্র পড়ে ছেলেটিকে শিখিয়ে দিল, তার এসব মন্ত্রতন্ত্রের ফলে যে বা যারা ছেলেটির সামনে আসবে তাদের ছেলেটি কি বলবে! কি চাইবে! কিছুক্ষণের মধ্যেই যাদুকরের মন্ত্রের প্রভাবে ছেলেটির সামনে একজন জিন রাজকুমার একটি সাপ হাতে হাজির হল। বলল, কে এই বাঁদীর বেটা—আমাকে ডেকে পাঠালে?
বাবুর্চি ছেলেটি হাত জোড় করে বললে, হুজুর আমি আপনার কৃপা-প্রার্থী।
—কেন কি হয়েছে কি? কৌতূহলী হয়ে জিনরাজকুমার ততক্ষণে বাবুর্চি ছেলেটির দিকে তাকাতে শুরু করেছে।
ছেলেটি তখন আগাগোড়া ওকে সব ব্যাপারটাই খুলে বলে। সব শুনে জিনরাজকুমার বলে, ঠিক আছে তোমরা যা করছো তাই চালিয়ে যাও। সব হবে।
বলে জিনরাজের বেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
যাদুকর তখন ছেলেটিকে বললে, যাও এবার তুমি তোমার কাজ শুরু কর। যেমন যেমন বলেছি তাই যেন হয়।

যাদুকরের কথামত ছেলেটি সব কাজ সুন্দরমত গুছিয়ে করায় পর

যাদুকর এবার বলল, যাও তুমি এবার ভাল জামাকাপড় পড়ে এসো ব্যাটা। তোমার পিয়ারী খলিফার বেটী এখন তোমার কাছে আসছে।

কথাটা শুনেই আর আনন্দ ধরে না ছেলেটির। এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে খুব সুন্দর জামাকাপড় পরে এসে দাঁড়াতেই দেখে তখনো হাত নেড়ে কিসব যেন মন্ত্র পড়ে চলেছে যাদুকর।

যাদুকরের মন্ত্র শেষ হতেই অবাক কান্ড। হঠাৎ ছেলেটির নজরে পড়ল, ঘরের দরজা দিয়ে একটা অতি সুন্দর বিছানা ঢুকছে। আর তার ওপরই অতি আকাঙ্খিত খলিফার সেই মেয়েটি শুয়ে আছে।

যাকে এতদিন শুধু দূর থেকেই দেখেছে; আজ তাকে একদম হাতের সামনে দেখে তো ছেলেটি নিজেকে আর সামলাতে পারল না। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল; এ কি করে হল! এত বড় তাজ্জব ব্যাপার!

ছেলেটি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই যাদুকরের হাতটা ধরে বলল, চাচা আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার এই ঋণ এ জীবনে আর শোধ করতে পারবো না আমি।

—আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তুমি তো খলিফার বেটির সঙ্গে আলাপ সালাপ কর; পরে না হয় আমার সঙ্গে কথা হবে। আমি এখন চললাম। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

যাদুকর চলে যেতেই বাবুর্চি ছেলেটি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে খলিফার মেয়ের বিছানার পাশে বসল। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় মেয়েটিকে একটু একটু করে ধাক্কা দিতে

লাগল।
ধাক্কা খেয়ে জেগে গেল মেয়েটি। কিন্তু অপরিচিত পরিবেশে, সামনে সম্পূর্ণ আরও অপরিচিত এক নবীন যুবককে দেখে বলে উঠল, কে তুমি ?
ছেলেটি বলল, বিবি সাব আমি তোমার বান্দা যাকে তুমি পাগল করেছো।
একেই ছেলেটি রূপবান তারওপর এমন সুরেলা গলায় কথা বলায় মেয়েটি অনেকক্ষণ সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে বলল, আল্লার কসম সত্যি করে বলো তো তুমি কে ? তুমি মানুষ না কোনো জিন ?
—এই মর্তেরই খাঁটি মানুষ বিবিসাব।
—তাহলে আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে আমি এলাম কি করে ? কে আনল আমায় ?
—আল্লার দোয়ায় তোমাকে এখানে এনেছেন স্বর্গের দেবদূত আর জিনেরা।
মেয়েটির প্রথম থেকেই ছেলেটিকে ভাল লাগছিল। এবার দেবদূত আর জিনের কথায় বলল, যদি তাঁরাই এনে থাকেন আর তোমার সঙ্গে যদি তাদের যোগাযোগ থাকে তবে তুমি তাঁদের বলে দিও আমাকে যেন রোজ তাঁরা এখানে নিয়ে আসেন।
—যো হুকুম বিবিসাব। আমিও তো তাই চাই।
বলতে বলতে ছেলেটি এবার মেয়েটির সঙ্গে কত গল্পইনা জুড়ে দিল।
এদিকে ভোরের আলো ফোটার আগেই যাদুকর এসে হাজির হল সেখানে। বলল, লোকজন টের পাওয়ার আগে এবার যে মেয়েটাকে

ফেরৎ পাঠাতে হবে বেটা। ভয় নেই। এখন পাঠিয়ে দেব। আবার রাত্রে তোর কাছেই নিয়ে আসব ওকে।

ছেলেটার মুখে এবার হাসি ফুটল। প্রথমে ভেবেছিল মেয়েটাকে বুঝি চিরদিনের মতই রেখে আসতে চায়। কিন্তু যখন শুনল আবার তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে যাদুকর তখন তার মুখে আবার হাসি ফুটল।

একটু পরে ভোরের আলো ফোটার আগেই খলিফার মেয়ে আবার বিছানাসহ চলে গেল তার নিজের বাড়িতে।

আর এভাবেই প্রায় দু'তিন মাস কেটে গেল। কোথাও কিছু নেই। বেশ আনন্দেই আছে খলিফার বাবুর্চি ছেলেটি।

কিন্তু একদিন কি করে যেন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল খলিফার প্রাসাদে।

খলিফার বেগমের চোখেই প্রথম ধরা পড়ল। আর সেই এরপর জানাল খলিফাকে।

শুনে খলিফা তো রেগে আগুন। কি? এতদূর আস্পর্ধা মেয়ের!

মেয়েকে ডেকে খলিফা ভয়ংকর রেগে বলল, সব সত্যি করে বলবি। যদি ঠিক ঠিক সব না বলিস তবে তলোয়ারের এক কোপে এখুনি তোকে আমি শেষ করে দেব।

বাবার রাগের কথা মেয়ের জানা ছিল। তবুও সে সবটা বলতে পারল না ঠিক গুছিয়ে। আসলে মেয়ে নিজেও তো জানে না, কি করে সে ওই ছেলেটির ঘরে চলে যায় রোজ রাতে। যাক তবু যতটা বুঝতে পেরেছিল সেভাবেই সে বলার জন্য প্রস্তুত হয় খলিফার সামনে।

খলিফা আবার মনে করিয়ে দেয়, সব ঠিক ঠিক বলবি। সব সত্যি বলবি।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ে স্থির হয়ে বলে, বাবা মিথ্যে কেন বলব? মিথ্যে কথায় সাময়িক ভাবে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে পার পাওয়া যায় না। আসলে আমি তোমাদের কাছে এত ইতস্ততঃ করছি কেন জানো? তার কারণ ব্যাপারটা আমার মাথায়ও ঢুকছে না ভাল করে। বেশ কিছুদিন হল রোজ রাত্রে আমার বিছানা শুদ্ধ কে যে আমাকে তুলে নিয়ে এক অপরূপ সুন্দর যুবকের ঘরে রেখে আসে আমি নিজেও ঠিক বোঝাতে পারব না। সারারাত ওই যুবক আমার সঙ্গে কথা বলে। গল্প করে। তারপর ভোর হবার আগেই কে যেন আবার বিছানাশুদ্ধ আমাকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে আবার ঘরে রেখে যায়।

খলিফা শুণে তো তাজ্জব! বলে কি মেয়েটা? কিন্তু এখন কি করা যায়? ভেবে ভেবেও কোনো কিছু বার করতে না পেরে

মেয়েকে যেতে বলে তিনি উজীরকে ডেকে পাঠালেন। উজীর অভিজ্ঞ আর অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই এর একটা উপায় বার করতে পারবেন।

উজীর এলে তাকে সব খুলে বললেন খলিফা। সব শুনে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন তিনি! তারপর মুখ খুললেন—

—জাঁহাপনা পেয়েছি—উপায় একটা বার করেছি আমি। এবার আমি বার করতে পারবো বিছানাসহ শাহজাদীকে রোজ কোন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

—পারবে! পারবে তুমি? খলিফার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উজীরকে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কি করে পারবে?

—কি করে? বলছি। কিন্তু তার জন্য একটা জিনিষ চাই।

—জিনিষ! কি জিনিষ বল তো?

—একটা থলে ভর্তি সরষে চাই আমি।

এখুনি খলিফার হুকুমে এক থলে ভর্তি সরষে নিয়ে আসা হল। উজীর থলেটা নিয়ে তার মুখে একটা ফুটো করে শাহজাদীর বিছানার বালিশের কাছে রেখে বললেন, জাঁহাপনা রাত্রে যখন এই বিছানাটা অজানা বাড়িতে কেউ নিয়ে যাবে তখন এবং ভোরে যখন আবার এই প্রাসাদে ফিরিয়ে আনবে তখন ওই থলে থেকে সরষে পড়তে পড়তে আসবে। এতে আমরা সেই বাড়ির রাস্তা ও বাড়িটা—দুটোই ধরে ফেলব।

খলিফা শুনে তো খুব খুশী। এই না হলে উজীর।

সেদিন রাত্রেই শাহজাদীর বিছানা যখন আবার উড়ে চলল তখন উজীরের বাঁধা সেই থলেটা থেকে ঝির ঝির করে সরষে পড়তে

পড়তে চলল। আবার ফেরার পথেও তাই। ফলে খলিফার প্রাসাদ থেকে বাবুর্চি ছেলেটির বাড়ি পর্যন্ত সরষের একটা লাইন টানা হয়ে গেল। খলিফা এবার চিনে ফেললেন বাড়িটা।

খবরটা কিন্তু ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যাদুকর। সে এসেই ভোরের দিকে ছেলেটিকে নির্জন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলল, বেটা খুব সাংঘাতিক কান্ড হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। তাছাড়া খলিফা তোমার বাড়ির কথাও জেনে ফেলেছে। এখুনি তোমাকে শায়েস্তা করতে আসছেন তাঁরা।

যাদুকরের মুখ থেকে এসব শোনার পর ছেলেটি বলল, চাচা এখন আর এসব আমি ভয় করি না। আমি বিশ্বাস করি আমরা সবাই এখানে আল্লার নির্দেশেই আছি, আবার তাঁর নির্দেশেই তাঁর কাছে ফিরে যাই। কাজেই ওরা যদি আমাকে এখন মেরে ফেলে—ফেলুক। শাহজাদীর জন্য শহীদ হব আমি। কিন্তু আপনি একজন মহানুভব বিদেশী। নিজেকে এই ঝামেলায় না জড়িয়ে, আপনি এখান থেকে চলে যান এখন। আমার জন্য অনেক করেছেন। আপনার সাহায্যেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। মরতে এখন আর ভয় নেই আমার।

বাবুর্চি ছেলেটির কথা শুনে যাদুকর তো হেসেই খুন! বলে কি ছেলেটা? বলে কি না শাহজাদীর জন্য শহীদ হবে। আরে তাহলে আর সে আছে কেন? যাদুকর তাই বলল, দূর বেটা! তোমার যত গোলমালের কথা। অত ভাবছো কেন? দেখইনা ওদের আমি কি করি! কেমন নাস্তানাবুদ করে ছাড়ি —।

ছেলেটি এ কথায় প্রচন্ড খুশি হয়। একটু এগিয়ে এসে যাদুকরকে বলে, চাচা সত্যি আপনার তুলনা হয় না। আপনার এই ঋণ

এ-জীবনে আর শোধ করতে পারব না আমি—

এ-কথায় যাদুকর শুধু মিটমিট করে হাসে। ছেলেটির মাথায় হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

এদিকে হয়েছে কি—যাদুকর আর বাবুর্চি ছেলেটি যখন এমনি সব কথাবার্তা বলছিল, সে সময়ে সেই সরষের লাইন ধরে খলিফা আর উজীর বেরিয়ে পড়েছেন ছেলেটির খোঁজে।

যাদুকর মন্ত্রবলে তা জানতে পেরেই ছেলেটিকে বলল, নাও আর দেরী কোর না। খলিফা তাঁর উজীরকে নিয়ে এই এসে পড়ল বলে। ওরা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়।

—তাহলে! ছেলেটি খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে বলল, আপনি এখন কি করতে বলেন?

—শোনো—যাদুকর বলল, শিগগির একটা বদনা ভর্তি করে জল নিয়ে এসো। আমি মন্ত্র পড়ে দিলে সেই বদনার জল তুমি তোমার বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে দাও। দেখোই না কি হয়!

বাবুর্চি ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। একটু পরেই এক বদনা জল নিয়ে এলে যাদুকর তাতে মন্ত্র পড়ে দিল। এরপর ছাদে উঠে ছেলেটি সেই জল নিজের বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিতেই মুহূর্তে বাড়িটা একটা দ্বীপের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। আর তার চার পাশে প্রকাণ্ড জলের ঢেউ। যেন একটা সমুদ্র চলে গেছে বাড়ি-টার চারপাশ দিয়ে

বাবুর্চি ছেলেটির চোখ তো ছানাবড়া! তবে তার চেয়েও প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল খলিফা আর উজীর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরষের লাইন ধরে ধরে এতক্ষণ বেশ ভালমতই এগোচ্ছিলেন; হঠাৎ এখানে এসে এত জল দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন।

খলিফা বললেন; কি ব্যাপার বল তো উজীর! নদী তো এখান থেকে অনেক দূরে। অথচ এখানে এত জল! জল তো কোনো-দিন দেখিনি এখানে।

উজীর ততক্ষণে বেশ ভাবনায় পড়েছেন। চারদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললেন, হ্যাঁ জাঁহাপনা—আপনি ঠিকই বলেছেন তাইগ্রীস নদী তো আর এখানে আসতে পারে না। আমার তাই মনে হয়, এ জল আসল জল নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো যাদুর ব্যাপার। এই জলে নামলে কিছুই হবে না। আসলে ওরা ভয় দেখাচ্ছে—যাতে জল দেখেই আমরা পালিয়ে যাই। কিন্তু তা হবে না। আমাদের লোক-লস্করদের এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিন আপনি জাঁহাপনা।

উজীরের কথায় খলিফা আর দেরী করলেন না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। খলিফার হুকুমে লোকজন সব জলে নামতেই সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানে তারা ভেসে গেল কে কোথায়!

উজীরের ততক্ষণে সন্দেহ হয়েছে। খলিফার দিকে তিনি তাই বললেন, না খোদাবন্দ এভাবে হবে না। আমার মনে হয়; ও বাড়িতে যারা থাকে তাদের শরণাপন্ন হতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই।

যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারবেন না খলিফা। খলিফার লোক-জন তখন, জলের ওপার থেকে বাবুর্চি ছেলেটির বাড়ির দিকে তাকিয়ে খুব জোরে চেঁচিয়ে তাদের আসার কারণটা জানালেন।

যাদুকরের পরামর্শ মত বাবুর্চি ছেলেটি তখন ছাদের ওপরে উঠে পাল্টা উত্তরে খলিফাকে জানালেন, জাঁহাপনা আপনারা যদি প্রাণে বাঁচতে চান তো সবাই ফিরে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা

আপনার প্রাসাদে যাচ্ছি। তখন সেখানেই কথা হবে।

শুনে খলিফা তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন স্বয়ং উজীর। বললেন; জাঁহাপনা ও বাড়িতে জিন পরিবারের কেউ নিশ্চয়ই থাকে। নাহলে আপনার মুখের ওপরে কথা বলার সাহস কখনো হয়। কাজেই এ ব্যবস্থায়ই মেনে নেন আপনি। ওদের আগে আসতে দিন আপনার প্রাসাদে।

কিন্তু খলিফা কি আর রাজী হয়? তবু অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করালেন উজীর। রাজী হলেও মনে মনে ভয়ংকর রেগে উঠলেন। ভাবলেন, ঠিক আছে একবার প্রাসাদে আসুক—দেখাচ্ছি মজা। মুণ্ডটা কোথায় থাকে আমিও দেখব।

ভাবতে ভাবতে উজীরের সঙ্গে লোক-লস্কর-সেপাইসহ ফিরে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাদুকরকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটি উঠল এসে

খলিফার প্রাসাদে। আর ঢুকতে না ঢুকতেই খলিফার আদেশে বন্দী হতে হল তাদের। তারপর প্রাসাদের ভেতরে খলিফার কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া হল; সঙ্গে সঙ্গে একজন জল্লাদকে ডাকলেন তিনি।

জল্লাদ এসে খাঁড়া নিয়ে দাঁড়াল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে খলিফা বাবুর্চি ছেলেটির দিকে জল্লাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন; এখুনি ওর মুন্ডুটা কেটে নাও—

হুকুম পাওয়া মাত্রই ছেলেটার মুখের দিকে তাকালো জল্লাদ। তারপর চটপট একটা কাপড় দিয়ে ওর চোখদুটো বেঁধে খাড়াটা ওপরে তুলে ধরল। কিন্তু কোপ লাগাতে গিয়েই অদ্ভুত ব্যাপার! জল্লাদের হাতটা কেমন আপনা থেকেই ঘুরে গেল অন্যদিকে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল খলিফার একজন পরিচিত। তার গলায় কোপটা লাগতেই মুন্ডুটা ছিটকে পড়ল খলিফার পায়ের কাছে।

খলিফা তো রেগে আগুন। জল্লাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আবার তাকিয়ে বলল; ছেলেটার মুন্ডুটা কেটে নিতে। জল্লাদ আবার তৈরী হল। খাড়াটা আবার উপরে তুলল। কিন্তু এবারেও তার হাত থেকে খাড়াটা ঘুরে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খলিফার আর একটি পরিচিত লোকের মুন্ডুটা উড়ে গেল।

খলিফা আর উজীর তো থ। ব্যাপারটা কি! জল্লাদ তাদের অনুগত। আজ পর্যন্ত সে কোনোদিনই অবাধ্য হয় নি। এমন কি আজও স্পষ্ট দেখছে, জল্লাদ খাড়া তুলে ছেলেটার ঘাড়ে কোপ বসাতে যাচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য! খাড়াটা দু-দুবারব অন্যদিকে ঘুরে গেল। খলিফা উজীরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বল তো উজীর?

উজীর বললেন, জাঁহাপনা ছেলেটার সঙ্গে ওর ওস্তাদকে দেখুন। ওই ওস্তাদই হল নাটের গুরু। ওর জন্যই এই অবস্থা ! দেখলেন না, ছেলেটা প্রতি মুহূর্তে কেমন ওই লোকটির দিকে তাকাচ্ছিল। আপনি বরং ওর সঙ্গেই কথা বলুন। আমার মনে হয় তাহলে সব কিছুই জানা যাবে।

—তা তুমি খারাপ বলনি উজীর। আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছিল – বলে খলিফা এবার উজীরের পরামর্শ মত বাবুর্চি ছেলেটির চোখের বাঁধন খুলে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

ছেলেটির চোখ খোলা হলে খলিফা যাদুকরকে বললেন, বুঝতে পারছি জনাব, আপনিই সব জানেন। কিন্তু আমার মেয়ের এমন সর্বনাশ করলেন কেন? আমি আপনার কাছ থেকেই সবটা শুনতে চাই।

যাদুকর এবার লজ্জা পেয়ে বলল, না জাঁহাপনা আমার এই যুবক বন্ধুর কোনো দোষ নেই। আসলে আমি একজন ভ্রাম্যমান বিদেশী যাদুকর। এই শহরে এসে, এই তরুণ বাবুর্চি বন্ধুটিকে খুব বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখে আমারও নজরে পড়ে যায়। ফলে ওর কাছ থেকেই একদিন জানতে পারি ওর ওই দুঃখের কারণ। আপনার কন্যা শাহজাদীর জন্যই এই অবস্থা ওর। কাজেই জাঁহাপনা ওর দুঃখের দিনে ওর পাশে এসে দাঁড়াবার জন্যই আমি এসব করেছি। আপনি এখন ওদের বিয়েটা দিয়ে দিন। এটা আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ।

খলিফা যাদুকরের কথাটা মাথা পেতে নিলেন। তিনি রাজি হলেন মেয়ের সঙ্গে বাবুর্চি ছেলেটির বিয়ে দিতে।

বাবুর্চি-ছেলেটিকে তখন খলিফার আদেশ মত নানারকম সুন্দর

পোশাকে সাজিয়ে একটা আসনে বসানো হল। যাদুকরও তার পাশে বসল। খলিফা যেখানে বসে ছিলেন, তার পেছনে সুদৃশ্য একটি পর্দায় একজোড়া সিংহের ছবির দিকে একমনে তাকিয়ে রইল। একটু পরে খলিফা যাদুকরকে কি দেখছে

জিজ্ঞেস করতেই যাদুকরের একটু মজা করার ইচ্ছে হল। সঙ্গে সঙ্গে খলিফাকে জানিয়ে সিংহ দুটোকে জীবন্ত করে তুলল সে। প্রাণ পেতেই সিংহদুটো খলিফার পেছনের দিকটায় নিজেরা গা জড়াজড়ি করে গর্জন তুলল। একটু পরেই আবার মন্ত্রবলে সে দুটোকে ছবির সিংহ করে দিল।

যাদুকরের ক্ষমতায় ক্রমশ মুগ্ধ হয়ে গেলেন খলিফা আর উজীর। তাঁরা তাকে আরও নানারকম যাদু কৌশল দেখাতে অনুরোধ করলেন।

যাদুকর রাজি হল। খলিফাকে বলল, একটা প্রকান্ড বড় দেখে লোহার কড়াই এনে তাতে এক কড়াই জল ঢেলে দিতে হবে। তাহলে এবার সে অনেক নতুন নতুন খেলা দেখাবে।

খলিফার আদেশে তাই আনা হল। যাদুকর তখন স্বয়ং খলিফা আর উজীর নিয়ে নানারকম খেলা দেখাতে শুরু করল।

প্রায় কয়েক ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল। একসময় খলিফা আর উজীর যাদুকরের যাদুর মায়ায় নাস্তানাবুদ হতে হতে আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে এলেন। তখন আর তাঁদের সন্দেহ রইল না যে এই যাদুকরের মত এমন অসীম ক্ষমতাবান যাদুকর তাঁরা অনেকদিনই দেখেননি।

এরপর আর দেরী করলেন না খলিফা। নিজের মেয়ের সঙ্গে বাবুর্চি ছেলেটির বিয়ে দিয়ে দিলেন। সে বিয়েতে যা জাঁকজমক হয়েছিল তা বলেও শেষ করা যায় না। একমাস ধরে চলল নানা উৎসব আর খাওয়া-দাওয়া। এই উৎসবে কিন্তু খলিফা বিদেশী যাদুকরকে অনেক ভাল ভাল খাওয়ালেন নিজে সামনে দাঁড়িয়ে। উৎসবের শেষে যাদুকর চলে যেতে চাইলে খলিফা কিন্তু যেতে দিলেন না তাকে। নিজের কাছেই তাকে থাকার জায়গা করে দিলেন। তাছাড়া এমন গুণী লোককে ছাড়বেনই বা কেন? কখন কি দরকার লাগে বলা যায় না তো!

সওদাগর সিন্দ্‌বাদ, রকপাখি ও হীরে পাহাড়ের গল্প

অনেকদিন আগের কথা। বাদশা হারুন-অল-রসিদের রাজত্বকালে বাগদাদ শহরে একজন ধনী সওদাগর বাস করতেন। সওদাগরের এক ছেলে ছিল। নাম সিন্দ্‌বাদ। ছেলেবেলা থেকেই সিন্দবাদের স্বপ্ন ছিল বাবার মত সেও একদিন দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যাবে। সওদাগর এক-একবার বাণিজ্যে যেতেন আর প্রচুর ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য, টাকা-কড়ি নিয়ে আসতেন বিভিন্ন দেশ থেকে জিনিসপত্র কেনাবেচা করে। কিন্তু মানুষের শরীর তো! কদিন আর এত ধকল সহ্য করতে পারবেন! ফলে বয়স হলে একদিন সওদাগর মারা গেলেন।

সওদাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত, টাকা পয়সার মালিক হল সিন্দবাদ। হঠাৎ হাতে এত টাকা পেয়ে বেশ কিছুদিন সে টাকায় আমোদ-স্ফূর্তি করে কাটাল সে। কিন্তু জমানো পয়সা কতদিনই বা থাকে? টাকা ফুরিয়ে আসার আগেই সিন্দবাদ একদিন ঠিক করল, এবার সে বাণিজ্য করতে দূরদেশে যাবে। বাবার মতই অনেক দূরে দূরে গিয়ে জিনিসপত্র বেচা-কেনা করে প্রচুর টাকা নিয়ে আসবে সঙ্গে।

যেই না ভাবা, অমনি শুরু হল কাজ। হাতে টাকা পয়সা যা ছিল তা দিয়ে বেশ কিছু জিনিস কিনে জাহাজে তুলে একদিন সমুদ্রে ভেসে পড়ল সিন্দবাদ। নানা দেশ ঘুরে জিনিসপত্র বেচাকেনা করল। এখানকার জিনিস ওখানে বেচল। ওখানকার জিনিস এখানে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন ঘটল একটা অঘটন।

এক জায়গায় এসে সমুদ্রের এক চড়ায় জাহাজ ঠেকেছিল। চড়া দেখে কয়েকদিনের সমুদ্রযাত্রার একঘেয়ে ক্লান্তি তাড়াবার জন্য সবাই ভাবল, এখানেই রান্নাটান্না সেরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

ভাবতে না ভাবতেই সেই চড়ায় নেমে এল অনেকেই। নেমে আগুন জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

সিন্দবাদও নেমে এসেছিল তাদের সঙ্গে। নেমে ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চান সেরে নেবে বলে জলে নেমে পড়ল।

সিন্দবাদ অবশ্য একা নয়। তার দেখাদেখি আরও অনেকেই চানের জন্য নেমে পড়েছিল জলে। আনন্দে মনের সাধ মিটিয়ে জলে চান করছিল।

হঠাৎ একটা চিৎকার! পেছনে তাকিয়ে ততক্ষণে অনেকেরই

নজরে পড়েছে, জাহাজ থেকে ক্যাপ্টেন চিৎকার করে কি যেন বলছে সবাইকে। একটু পরেই সবাই বুঝতে পারল ক্যাপ্টেনের কথা। ক্যাপ্টেন বলল, শিগগিরই চলে এসো তোমরা। করেছো কি? এটা কি কোনো দ্বীপ ভেবেছো নাকি! না—না এটা দ্বীপ নয়। এটা একটা তিমি। এখুনি আগুনের তাপ পেয়ে নড়েচড়ে উঠবে। আর তাতেই জাহাজসহ সবাইকে ডুবিয়ে মারবে। শিগগিরই চলে এসো তোমরা।

বলতে না বলতে যে যেখানে ছিল; পড়িমরি করে ছুটে এল জাহাজের দিকে। সিন্দ্‌বাদেরও কানে গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের কথাটা। কিন্তু জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে চান করছিল সে। ছুটে এসে জাহাজে উঠতে না উঠতেই জাহাজটা ছেড়ে দিল। আর ঠিক একটু পরেই তিমিটা নড়ে উঠেই ভুস করে ডুবে গেল গভীর সমুদ্রের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দবাদই ছিটকে পড়ল সমুদ্রের ভেতরে।

সিন্দ্‌বাদ ভাল সাঁতার জানত। সাঁতার দিয়ে সে জাহাজটা ধরতে গেল। কিন্তু আর কি ধরা যায়? তিমির হাত থেকে বাঁচার জন্য জাহাজটা তখন প্রাণপণে ছুটছে। সিন্দবাদ আর কি করবে! জাহাজের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিল। একসময় জাহাজটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেলে ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে সে এগিয়ে চলল।

ভাসতে-ভাসতে ভাসতে-ভাসতে সারাদিন সারারাত তার সমুদ্রের ওপরই কাটল। এক সকালে বিরাট একটা ঢেউ তাকে এক ধাক্কায়

পেঁৗছে দিল একটা বালির চরে। তখন আর শরীরে এতটুকুও শক্তি নেই। একটু এগিয়ে হাঁটতে না হাঁটতেই বালির চরে বসে পড়ল। তারপর সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মরার মত।

ঘুম ভাঙল অনেকক্ষণ পরে। ততক্ষণে তার খিদে পেয়ে গেছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সিন্দ্‌বাদ চলল খাবারের খোঁজে।

একে অচেনা দেশ। তার ওপর এগিয়ে যেতে যেতে সিন্দ্‌বাদের চোখে পড়ল গভীর জঙ্গল। জঙ্গলে ঢুকে বুনো ফল দেখে তাই পেড়ে খেয়ে খিদে মেটালো সিন্দ্‌বাদ। একটা ঝরনা দেখতে পেয়ে তার জল খেলো। এবার একটু শরীরে শক্তি পেয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সে চলল আরও ভেতরের দিকে। যদি কোনো মানুষের দেখা মেলে!

খানিকক্ষণ যাওয়ার পরে চোখে পড়ল গভীর গাছপালার জঙ্গল শেষ হয়ে এবার লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের জঙ্গল শুরু হয়েছে। সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল সিন্দবাদ। কিন্তু একটু গিয়েই কি দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ঘাসের জঙ্গলে কি যেন নড়ছে। সাহস নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই সিন্দবাদের চোখে পড়ল একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। কিছুটা দূরে ঘোড়ার সহিস চুপচাপ বসে তাই দেখছে।

লোকটাকে দেখে সিন্দ্‌বাদের মনে আশা জাগল। এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে সে জানাল তার বিপদের কথা। লোকটা সব শুনে সিন্দ্‌বাদকে বলল, কোনো চিন্তা নেই। আমি এদেশের মহারাজার সহিস। চলো তোমাকে আমি মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

সেই ঘাসবন পেরিয়ে, পাহাড় নদী জঙ্গল পেরিয়ে লোকটি এরপর

তাকে নিয়ে গেল মহারাজার দরবারে।
সব শুনে রাজা বলল, ঠিক আছে তুমি এখানেই থেকে যাও। তোমার মত একজন লোকই খুঁজছিলাম। আজ থেকে তোমাকে আমার জাহাজ-ঘাটা দেখাশোনার ভার দিচ্ছি।
তাই হল। সেই থেকে সিন্দবাদও থেকে গেল নতুন রাজার কাজ নিয়ে তার দেশে।

খায় দায়। কাজ করে। সুখেই তার দিন কাটে। তবু তার প্রিয় বাগদাদ শহরের জন্য মাঝেমাঝেই মন খারাপ হয়ে যায়। রোজই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়ায় আর দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে যদি কোনো জাহজ দেখা যায়, তাহলে সেই জাহাজ ধরেই সে ফিরে যাবে বাগদাদের দিকে। কিন্তু মনের ইচ্ছে তার মনেই থেকে যায়। কোনো জাহাজ আর আসে না এদিকে।
এমনি করেই দিন কাটে।

কয়েকদিন পরে এমনি একদিন সমুদ্রের পাড়ে ঘুরছিল; হঠাৎ মাঝিদের মুখে শুনল একটা অদ্ভুত ঘটনা। তারা বলল, সে দেশের কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে নাকি ভয়ংকর একটা চর আছে। কিন্তু সেখানে কেউ যেতে পারে না। কেননা দিনের বেলায়ও নাকি ভূতেরা সেখানে বাঁশী বাজায়। সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে সে বাঁশীর শব্দ নাকি অনেকেই শুনেছে।

সিন্দবাদকেও তারা শোনাল সেই শব্দ। শুনেই সিন্দবাদ কি যেন ভাবল। তারপর সে দেশের মহারাজের কাছে গিয়ে বলল; মহারাজ যে চরে দিনের বেলাতেও ভূতেরা বাঁশি বাজায়, সে চরে একবার আমি যেতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন—

রাজা শুনে তো অবাক! বলে কি বিদেশী লোকটা! একটুও কি ভয়ডর নেই?

একটু তাকিয়ে রাজা তাই বললেন, সে কি! ভয় করবে না তোমার! ওখানে যে শুনি অপদেবতার বসবাস।

—তা হোক মহারাজ! সিন্দবাদ জোর গলায় বলল, এ সব তো সবাই বলে। কিন্তু নিজের চোখে গিয়ে তো কেউ দেখে আসেনি আজ পর্যন্ত! তাই আমি দেখে আসতে চাই—সত্যি সত্যিই ভূত আছে না অন্যকিছু? শুধু আপনি যদি অনুমতি দেন—

রাজা সিন্দবাদের সাহস দেখে খুশি হয়েই অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত ছোট একটা ডিঙিতে খাবার-দাবার আর জলটল নিয়ে সিন্দবাদ রওনা হয়ে গেল সেই চরে। কিন্তু আশ্চর্য! চরে পৌঁছে খুবই হতাশ হতে হল সিন্দবাদকে। কোথায় ভূত! ভূত তো দূরের কথা কুকুর-বেড়ালও নেই সেখানে। তবে এক ধরণের লম্বা লম্বা পাতাওয়ালা গাছ আছে,

যে পাতা হাওয়ার সঙ্গে দোল খেয়ে অদ্ভুত বাঁশির মত একটা আওয়াজ তোলে। বুঝল, এই শব্দকেই ওদেশের লোকেরা বলে ভূতের বাঁশ।

ফিরে এসে সিন্দবাদ সব কথা বলল রাজাকে। কোনো মানুষই নেই। তা ভূত জন্মাবে কি করে? আরও বলল, ওই চরের

মাটির কথা। জানাল; চাষবাস করলে ওখানে ভাল ফসল পাওয়া যাবে।

সিন্দবাদের কথায় সাহস পেয়ে অনেকে গেল সেখানে। গিয়ে চাষবাস করে প্রচুর ফসল পেল। হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়ে রাজা সিন্দবাদকে ডেকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন।

এদিকে হয়েছে কি, কিছুদিন বাদে একটা জাহাজ এসে ভিড়ল সে দেশের সমুদ্রের ধারে। সিন্দবাদ জাহাজটা দেখেই চিনতে

পারল। এ হলো সেই জাহাজ, যে জাহাজে করে সিন্দবাদ একদিন বণিজ্য করতে বেরিয়েছিল।
সিন্দবাদ জাহাজের দিকে এগিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন তাকে দেখে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে তাদের সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। মনে মনে সিন্দ্‌বাদ তো তাই চাইছিল। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজার দেওয়া সেই প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে সে জাহাজে উঠল।

এরপর অনেক দেশ ঘুরে জাহাজ দাঁড়াল এসে এক নতুন দেশে। ততদিনে রাজার দেওয়া সেই টাকায় আরও অনেক জিনিষ কিনে বেচে তা থেকে আরও অনেক লাভ করেছিল সিন্দ্‌বাদ। তাই নতুন দেশে এসে তার কাছে বেচার মত জিনিস না থাকায় খালি হাতেই জাহাজ থেকে নেমে সে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল। জায়গাটা খুব ভাল লাগল ওর। যেমন নির্জন তেমনি কত রঙ-বেরঙের ফুল ফলের গাছ। ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্জন জায়গায় এসে জায়গাটা ভাল লাগল বসে পড়ল সে। আর বসতে না বসতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সে নিজেও টের পেল না।
ঘুম ভাঙল যখন তখন বেলা পড়ে এসেছে। বুক দুর দুর করে উঠল সিন্দ্‌বাদের। এই রে সেই কখন জাহাজ থেকে নেমেছি। জাহাজ কি এখনো তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে? প্রায় ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখল, যা ভেবেছে—তাই। তাকে রেখেই জাহাজ কখন চলে গেছে বাগদাদের দিকে।
কি আর করবে? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সিনবাদের। আর

দেরী না করে সে তাই আশে পাশে কোনো মানুষজন কাউকে পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে বেরোল।

হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়েছিল সিন্দ্‌বাদ। হঠাৎ তার নজরে পড়ল অনেকটা দূরে ফাকা মাঠের ভেতরে ধবধবে শাদা পাথরের চারতলা সমান একটা বিশাল উঁচু বাড়ি।

বাড়িটা দেখে সেই দিকেই ছুটল সিন্দ্‌বাদ। কিন্তু কাছে গিয়েই অবাক! এ কেমন বাড়ি ভেতরে ঢোকবার কোন দরজা জানলা নেই। শুধু নিরেট পাথর দিয়ে গড়ে তোলা দেয়ালটা আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। তবে যেমন মসৃণ তেল চকচকে, তেমন ধবধবে শাদা।

ঘুরে ঘুরে যখন বাড়িটা দেখছিল ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা কোন দিকে, সেই সময়ে আকাশের এক কোণে একটা কালো মেঘ নজরে পড়ল সিন্দবাদের। সিন্দবাদের। সিন্দ্‌বাদ ভাবল, সর্বনাশ! বোধহয় সাংঘাতিক একটা ঝড় আসছে। এবার তার রেহাই নেই। কোথাও যখন আশ্রয় পাওয়া গেল না তখন এবার মৃত্যু অনিবার্য। ঝড়েই তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রের ভেতরে।

ভাবতে ভাবতে আবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু এবার তাকাতেই চমকে উঠল সিন্দ্‌বাদ মেঘ কোথায়? এ যে বিশাল একটা রাক্ষুসে পাখি ডানায় ঝড়ের মত শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। কি পাখি ওটা? তবে কি নাবিকদের কাছে শোনা সেই রকপাখি? কি ভীষণ গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না সিন্দবাদ। এবারে বুঝল ওটা নির্ঘাৎ রকপাখি। আর এই গোলাকার দরজা জানলা বিহীন ঘরটা নিশ্চয়ই রকপাখির ডিম। ডিমে তা দেবার জন্যই

বোধহয় পাখিটা এদি'ক এগিয়ে আসছে।

গর্জনটা আরও একটু কাছে আসতেই ডিমের তলায় একটি জায়গায় চট করে লুকিয়ে পড়ল সিন্দ্‌বাদ। যেখান থেকেই দেখল পাখিটা আস্তে আস্তে আকাশ থেকে নেমে ডিমের উপর বসল। বসে চুপ করে অইল।

ততক্ষণে সূর্যটা ডুবে গেছে। দিনের আলোও ফুরিয়ে এসেছে। আবছা সে আলোয় রকপাখির বিশাল থামের মত একটা পা দেখে সিন্দ্‌বাদের মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। চটপট সে মাথায় লম্বা পাগড়িটা খুলে তাই দিয়ে ওই পাখির পায়ের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বাঁধল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল, পাখি কখন উড়বে।

অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঘুম ভাঙল হঠাৎ একটা সাঁই সাঁই শব্দে। চমকে উটেই সিন্দ্‌বাদ দেখল, সে উড়ে চলেছে বিশাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে নীল আকাশে ভেসে। চারপাশে তার হালকা চুলের মত মেঘেরা উড়ে যাচ্ছে। কখনো বা কালো রঙের বড় বড় মেঘ। সে মেঘগুলোর নিজেদের মধ্যে বার বার ধাক্কা লাগায় মাঝে মাঝেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই জলে ভিজে যাচ্ছিল সিন্দ্‌বাদের জামাকাপড়।

পাখির কিন্তু তাতে কোনো বিরাম নেই। এমন কি পায়ের সঙ্গে যে একটা মানুষ ঝুলছে তাও টের পায়নি সে। পাবে কি করে! আসলে অতবড় একটা প্রকাণ্ড চেহারা; সিন্দ্‌বাদ তো সে তুলনায় একটা পিঁপড়ের মত। কাজেই গায়ে তাঁর পিঁপড়ে বসল, মাছি বসল তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

উড়তে উড়তে পাখি বসল এসে একটা পাহাড়ের গায়। কিছুক্ষণ

বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেশ বড় সাইজের একটা অজগর সাপ মুখে তুলে আবার উড়ল আকাশে। আর সেই সুযোগে পাগড়ির বাঁধনটা খুলে ফেলে সিন্দ্‌বাদও লুকিয়ে পড়ল পাহাড়ের একটা খাঁজে।

কিন্তু পাখি উড়ে যেতেই ভয়ে সিন্দ্‌বাদ চমকে উঠল। এ কোথায় এসে পড়েছে সে। এ যে সাপের পাহাড়। চারদিকে সব ভয়ংকর বিষাক্ত সাপেরা গা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। এক একটা অজগর তো এমন বড় যে জ্যান্ত এক একটা হাতী গিলে খেয়ে নেয়। তাছাড় যেমন ফোঁস ফোঁস শব্দ তেমনি নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

সিন্দ্‌বাদও নজরে পড়ে গিয়েছিল তাদের, কিন্তু ছোট সরু একটা পাহাড়ের খাঁজে লুকিয়ে থাকায় অতবড় শরীর নিয়ে সাপগুলো সেখানে ঢুকতে পারছিল না। ওই অবস্থায়ই সারাটা রাত সে সে সেখানে কাটিয়ে দিল কোনোরকমে।

ভোরের আলো ফুটলে চারদিক দেখে সিন্দবাদ একসময় বেরিয়ে এল সেখান থেকে। আর বেরোতেই চমকে উঠল। সেই পাহাড়ের চারিদিকে শুধু হীরে আর জহরৎ ছড়ানো। দেখা মাত্রই জামার যতগুলো পকেট ছিল তাতে ঠেসে ঠেসে সেই হীরে তুলে ভরে নিল। তারপর একটু এগোতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল।

একটা পাহাড়ের খাড়াই দেওয়াল উঠে গেছে অনেকটা ওপরের দিকে। সেখান থেকে তাল তাল কাঁচা মাংস পড়ছে হীরে আর জহরতের ওপরে। একটু দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাতেই সিন্দবাদের কানে এল, খাড়াই দেওয়ালের ওপারে যেন কারা কথা বলছে। এতদূরে আর এত নীচ ডেকে সে সব স্পষ্ট শোনা না গেলেও

রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠল সিন্দ্‌বাদের কাছে।
সিন্দ্‌বাদ বুঝল, অনেক সওদাগরের মুখে শোনা সেইঅমূল্য হীরের পাহাড়ে এসে পড়েছে সে। এখানে কেউ আসতে পারে না ওইসব ভয়ংকর সাপের ভয়ে। তাই অনেক ওপর থেকে বিশাল সাইজের এক-একটা কাঁচা মাংসের তাল এইসব মণিমাণিক্যের ওপর ছুঁড়ে মারে। একটু পরেই ঈগলপাখি এসে সেসব মাংসপিণ্ড তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে কোথাও বসে। লোকগুলো তখন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঈগলটাকে তাড়িয়ে সেই কাঁচা মাংসপিণ্ডের গায়ে লেগেথাকা হীরে-জহরতগুলো খুলে খুলে নেয়।
একটা বিশাল সাইজের মানুষ প্রমাণ মাংসপিণ্ড এসে ধপ করে সিন্দবাদের সামনে পড়তেই, সিন্দ্‌বাদ কায়দা করে নিজেকে বেঁধে ফেলল সেই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে। একটু পরেই একটা ঈগল এল। সেই মাংসখণ্ডের সাথে সিন্দ্‌বাদকে তুলে নিয়ে একটা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল অসংখ্য পাথর। প্রাণভয়ে পাখিটা মাংস খণ্ডটা ছেড়ে পালাতেই হই হই করে ছুটে এল অনেক মানুষ।
কিন্তু মাংসর গা থেকে হীরের টুকরোগুলো খুলে নেওয়ার আগেই তারা অবাক। মাংসর সঙ্গে একটা জ্যান্ত মানুষ লেগে আছে।
ততক্ষণে সিন্দ্‌বাদ নিজেকে মুক্ত করে লোকগুলোকে বলল তার কাহিণী। বলে যখন জানল তারা বাগদাদের দিকে যাবে, সিন্দবাদ সঙ্গে সঙ্গেই জানাল বাগদাদেই তার বাড়ী। যদি তার তাদের সঙ্গে ওকে নিয়ে যায় তবে যারপরনাই খুশি হবে সে।
লোকগুলো প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলে সিন্দবাদ তার পকেট থেকে হীরে তুলে প্রত্যেককে একটা করে হীরে দিল। আর এই

হীরে এমন দামী যে এগুলোর যে কোনো একটার বিনিময়েই একটা রাজ্যের প্রায় অর্ধেকটা কিনে নেওয়া যায়। কাজেই তেমন এক একটা হীরে পেয়ে লোকগুলো তো খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দ্‌বাদকে নিয়ে যেতে রাজীও হয়ে গেল তারা।

সিন্দ্‌বাদ ওদের সঙ্গে জাহাজে চড়ে নিজের দেশে ফিরল একদিন। আর হীরে পাহাড়ের হীরে বেচে খুব শিগগিরই সে হয়ে উঠল লাখপতি।

তখন আর তার আনন্দ দেখে কে!

সিন্দ্‌বাদ কানা দৈত্য ও
আজব দেশের আজব কাহিনী

প্রথম অভিযানের পরে ঘরে ফিরে বাগদাদে থাকতে আর মন চাইল না সিন্দ্‌বাদের। কিছুদিন আমোদ ফুর্তিতে কাটাবার পর আবার সে একদিন মাল-পত্তর নিয়ে উঠল জাহাজে। এবার ভাবল, অন্যদিকে অন্য দেশে যাবে।

কয়েকদিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন সমুদ্রে ঝড় উঠল। ঝড়ের দাপটে জাহাজটা যেন মোচার খোলার মত ঢেউয়ের ওপরে ভাসতে লাগল। এই ডোবে তো সেই ডোবে। তার ওপর হঠাৎ আবার আর এক বিপদ দেখা দিল। ঝড় একটু কমলে জাহাজটা যখন নির্জন একটা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় হঠাৎ কয়েক শ বাদর এসে বিরাট এক একটা লাফ দিয়ে তাদের

জাহাজে উঠে পড়ল। উঠেই তারা এক কাণ্ড করে বসল। জাহাজের লোকজনকে মেরেধরে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল। তারপর ক্যাপ্টেন আর সিন্দবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে জাহাজের এটা ওটা ঘোরাতে ঘোরাতে জাহাজটা চালিয়ে দিল।

তখনও সমুদ্রের ঝড় পুরোপুরি থামেনি। দ্বীপের ওপরে দাঁড়িয়ে সিন্দবাদরা দেখল অসংখ্য বাঁদর নিয়ে জাহাজটা পাগলের মত ঝড়ের ভেতরেই গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

জাহাজ তো গেল এবার তাদের কি হবে! সিন্দবাদের পরামর্শ মত সবাই তখন দ্বীপের ভেতরে ঢুকতে লাগল। সামনেই ছিল গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরে গাছে গাছে ছিল নানা ধরণের ফুল ও ফল। ফল দেখে তারা সবাই আশ্বস্ত হল। যাক্ তাহলে না খেয়ে মরবে না।

ভাবতে না ভাবতে পটাপট ফল ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল তারা। তারপর জঙ্গলের ভেতরের ঝরণা থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিয়ে দ্বীপটা দেখতে বেরোল।

অনেক জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড় পার হয়ে এসে আবার একটা জঙ্গলে ঢুকতে যাবে, সেই সময় নজরে পড়ল তাদের বিরাট একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা। কিন্তু দেখে মনে হয় পরিত্যাক্ত। কেউ থাকে না সেখানে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল তারা। সামনে গিয়ে একবার দাঁড়িয়ে, ভাল করে বাড়িটার চারদিক লক্ষ্য করে প্রকাণ্ড সিংহ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকতেই অবাক। বেশ ভয় পেয়ে গেল তারা। দেখল, দরজার একপাশে জড়োকরা অসংখ্য হাড়ের স্তুপ। পাশেই একটা

উণ্নন জ্বলছে। উণ্ননের নিচে মাটিতে রাখা বড় বড় লোহার শিক। সব দেখে যেন কিছু একটা আন্দাজও করে ফেলেছিল তারা।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড গর্জন। একটা আগুনের হলকা যেন তাদের পেছন থেকে উড়ে এল। পেছনে ফিরে তাকাতেই সিন্দবাদের নজরে পড়ল প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত বীভৎস দেখতে এক দৈত্য এসে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে।

ভয়ে তাদের মুখ থেকে কোনো কথা সরল না। দৈত্যটা ততক্ষণে

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার সবাইর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দলের মধ্যে সবথেকে মোটামত নাদুসনুদুস চেহারার একটি লোককে মুঠোর মধ্যে ধরে তুলে

নিয়েছে। তারপর একটা লম্বামত লোহার শিক টেনে নিয়ে মোটা লোকটাকে সেই শিকে ঢুকিয়ে উনুনের আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। প্রচণ্ড চীৎকার করে লোকটি পুড়ে ঝলসে যেতেই দৈত্যটা এবার সেই শিকটা টেনে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে লোকটাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। তারপর প্রকাণ্ড এক ঢেকুর তুলে সেই বাড়িরই একপাশে শুয়ে নাকে গর্জন তুলে ঘুমিয়ে পড়ল।

এতক্ষণ চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো পর পর ঘটে গেল, তাতে কোনোরকম বাধা দেওয়া বা কোনোকিছু বলা তো দূরের কথা; সিন্দবাদসহ এতগুলো লোক যেন একসঙ্গে বোবা হয়েছিল। দৈত্যটা ঘুমিয়ে পড়তে এবার সবার খেয়াল হল। আস্তে আস্তে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিন্দবাদ সবাইকে সমুদ্রের পাড়ে ডেকে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে রাত হয়েছে। সিন্দবাদ সবাইকে বলল, যে যেখান থেকে পারে, কিছু কাঠ আর লতা-পাতা যেন যোগাড় করে আনে। এক্ষুণি রাত থাকতে থাকতে চটপট কয়েকটা ভেলা তৈরী করে ফেলতে হবে। নাহলে উপায় নেই। এই দ্বীপেই সবাইকে দৈত্যের হাতে মরতে হবে। যেমনি বলা অমনি সবাই ছুটল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু কাঠ আর লতাপাতা এল। রাত থাকতে থাকতে পরপর কয়েকটি ভেলাও তৈরি হয়ে গেল সবার চেষ্টায়।

ভেলা তৈরী করতে করতে রাত ভোর হয়ে এসেছিল। উপায় না দেখে; দৈত্য জাগার আগেই আবার ওরা সেই বাড়িতেই ফিরে এল। গতকালের মত এবারও দৈত্য ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটা মোটামত লোককে বেছে নিল। তারপর আগের মতই তাকে শিকে

ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে গপগপ করে খেয়ে ফেলল। এরপরেই শুয়ে পড়ে ঘুম।

এবার বেশ রাগ হল সিন্দ্‌বাদের। মতলবটা আগেই ভেবে রেখেছিল দৈত্য ঘুমিয়ে পড়লে দুটো লম্বা লোহার শিককে আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লাল করে এবার সজোরে ঢুকিয়ে দিল দৈত্যের দুই চোখের ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড চীৎকার করে জেগে উঠল দৈত্য। কিন্তু উঠলে কি হবে! সে তো আর তখন দেখতে পায় না, তাই হাত বাড়িয়ে সিন্দ্‌বাদদের ধরার জন্য সে সারা বাড়িটায় ঘুরতে ঘুরতে প্রচন্ড গর্জনে বাড়িটা কাঁপিয়ে তুলল।

একটু পরে সুযোগ বুঝে সিন্দ্‌বাদরা যখন বাইরে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটতে সুরু করল দৈত্যটাও তখন তাদের পেছনে পেছনে আন্দাজে দৌড়ে আসতে লাগল।

সমুদ্রের ধারে সিন্দ্‌বাদদের তৈরী করা ভেলাগুলো সাজানো ছিল। তাড়াতাড়ি সেগুলোকে জলে ভাসিয়ে যে যার মত তাতে উঠে পড়ল।

ততক্ষণে দৌড়তে দৌড়তে দৈত্যটাও এসে পড়েছিল সেখানে। এসেই সমুদ্র পাড়ের পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাই তুলে আন্দাজেই ছুঁড়ে মারতে লাগল সেদিকে। পাথরের চাইগুলো কয়েকটা ভেলার ওপর এসে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে গেল সেগুলো। কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না সিন্দ্‌বাদ—কার কার ভেলা ডুবেছে। তার নিজের ভেলার ওপর যাতে পাথরের চাই এসে না পড়ে তার জন্য সে প্রাণপণে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটলে সিন্দ্‌বাদের নজরে পড়ল, একমাত্র তার

ভেলায়ই তারা তিনজন মাত্র বেঁচে আছে। বাকী কারো চিহ্ন নেই।

অগত্যা আর উপায় কি! বাকি দুজনকে নিয়েই দিনরাত ভেলা ভাসিয়ে সিন্দবাদ এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আবার একটা দ্বীপের দেখা পাওয়া গেল একটানা জলে ভাসতে ভাসতে সিন্দবাদরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে একটা ডাঙার দেখা পেতেই লাফিয়ে উঠল ওরা। ভেলাটাকে আস্তে আস্তে সেদিকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

দ্বীপে নামতেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল সিন্দবাদের। যেমন সুন্দর হাওয়া তেমনি চমৎকার দেখতে জায়গাটা। ঘুরতে ঘুরতে দুজনকে নিয়ে জঙ্গলের ফলমূল আর ঝরণার জল খেয়ে আবার ঘুরতে ঘুরতে বেরোল সঙ্গী দুজনকে নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তিনজনেই। দুপুরের দিকে একটা গাছের নীচে বসে কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ফোঁস-ফোঁস আওয়াজে। চমকে উঠেই সিন্দবাদ দেখল তার এক সঙ্গীর দেহের পেছনে প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। কি করবে বুঝতে না বুঝতেই সঙ্গীটিকে হঠাৎ পেচিয়ে ধরল সাপটা। তারপর পাকে পাকে

জড়িয়ে ধরে ক্রমশ তার দেহের ওপর চাপ দিতে লাগল। প্রচণ্ড নিষ্পেষণে সঙ্গীটির দেহের হাড়গুলো মড়ে মড়ে করে ভেঙে যেতে লাগল। হাড়ভাঙা শেষ হলে পরে গিলে খেয়ে নিল সঙ্গীটিকে।
এ-পর্যন্ত দেখেই বাকী সঙ্গীটিকে নিয়ে দৌড়ে পালাল সিন্দবাদ। ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল আর একটা জঙ্গলে। তারপর সারাদিন দুজনে এখানে ওখানে ঘুরে ঠিক সূর্য ডোবার পরেই একটা বড় গাছের মগডালে গিয়ে উঠে বসল। ভাবল এই ঘন জঙ্গলে এখানে নিশ্চয়ই আসতে পারবে না সাপটা।
কিন্তু আশ্চর্য! রাত একটু ঘন হতেই আবার হঠাৎ সেই ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। আর এবার লক্ষ্য করল সিন্দবাদ সাপটির মাথায় সেই অমূল্য রত্ন মণি বসানো আছে। তারই আলোয় চারদিক আলো করে লম্বা দেহটা পাকাতে পাকাতে গর্জন তুলতে তুলতে এদিকেই আসছে।
দেখতে দেখতে ঠিক ওদের গাছের নীচেই এসে দাঁড়াল সাপটা। তারপর প্রচণ্ড হাঁ করে উঁচু হতে হতে খুব লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে সিন্দবাদের বন্ধুটিকে টেনে গপ করে গিলে নিল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল, আবার সেদিকেই আস্তে আস্তে ফিরে গেল।
এতক্ষণ চোখবুজে বসেছিল। সাপটা চলে যেতেই বুঝল সিন্দবাদ; তারও রেহাই নেই। এবার তার পালা। এই দ্বীপে সে যেখানেই লুকিয়ে থাক; খুঁজে পেতে ঠিক বের করে নেবে তাকে ওই মানুষ খেকো রাখুসে সাপটা। ভাবতেই মনটা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেল সিন্দবাদের। ভোরের আলো ফুটতেই আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে সে খাবারের সন্ধানে বেরোল।

খেয়েদেয়ে সিন্দবাদ বেশকিছু কাঠ আর লতাপাতা জোগাড় করে সেদিন সকাল থেকেই একটা গাছের গোড়ায় খুব মোটা করে বাঁধল। শুধু ভেতরে একটু সামান্য ফাঁকামত জায়গা রেখে দিল; যাতে সন্ধ্যে হলেই সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে সে।

তাই হল। সূর্য ডুবতেই সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সিন্দবাদ। তারপর ভেতর থেকেই ওপরের ফাঁকা জায়গাটা ঠিকমত লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিল।

রাত একটু ঘন হতেই আবার গতরাতের মত চারদিক আলো করে সেই সাপটা এল। কিন্তু এবারে আর তার সুবিধে হল না। গত দুরাতে পরপর দুজনকে হজম করে এবার সিন্দবাদকে না ক্ষেতে পেয়ে গাছটার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগল। আসলে খাবে কি করে? খেলে তো গাছটাকেই পুরো গিলে খেতে হয়। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! ফোঁস ফোঁস করতে করতে সারারাত অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে একসময় আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে গেল।

ভোরের দিকে লতাপাতা আর কাঠের সেই খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সিন্দবাদ। সারারাত বলির পাঁঠার মত ভেতরে কাঁপছিল সে। বারবারই ভাবছিল, এই বুঝি লতাপাতার বাঁধন ছিঁড়ে সাপটা তাকে গিলে খেয়ে নেয়। যাইহোক ঈশ্বরের অশেষ করুণা। শেষ পর্যন্ত আর পারে নি! তবে আজ রেহাই পেয়েছে। কিন্তু কাল? কদিন আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে এভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পারে এসে মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছিল

সিন্দ্‌বাদ। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা জাহাজ যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দ্‌বাদ একটা লাঠির মাথায় নিজের পাগড়ি খুলে বেঁধে উঁচিয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের চোখে পড়ল সেই দৃশ্য। জাহাজ অনেকটা কাছে এনে একটা নৌকা পাঠিয়ে দিল সে। নৌকায় করে সিন্দ্‌বাদ উঠল গিয়ে জাহাজে। উঠতেই বুঝল, এ তার দেশেরই খুব পরিচিত এক জাহাজ। ক্যাপ্টেনের কাছে একসময় সে তার জিনিষপত্র বেচাকেনার বেশ কিছু টাকা রেখেছিল।

ক্যাপ্তেন সিন্দ্‌বাদকে দেখেই সেই টাকা ফেরৎ দিল। ফেরৎ টাকায় ফিরতি পথেই আবার জিনিস কেনাবেচা করে প্রচুর লাভ করে বাগদাদে ফিরল সিন্দ্‌বাদ।

কিন্তু কিছুদিন বাগদাদে কাটিয়ে আবার বাইরে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল সিন্দ্‌বাদ। এত বিপদ, পদে পদে এত ভয়ংকর ঘটনা আর জীবনের মায়া তুচ্ছ করেও যে দিনের পর দিন এভাবে ঘুরতে পারে, তার কি আর শহরে বসে থাকতে ভাল লাগে?

ভাল লাগেও না। একদিন আবার অনেক জিনিসপত্র কিনে একটা জাহাজে উঠে পাড়ি জমাল দূর দেশের দিকে।

কিন্তু সময়টা এবার ভাল ছিল না। জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই শুরু হল ঝড়। সমুদ্রের ঢেউ উঠল আকাশ প্রমাণ হয়ে। আর জাহাজগুলোও নাচতে লাগল সেই ঢেউয়ের মাথায় নাচতে লাগল খেলনার মত। জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল সিন্দ্‌বাদ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। জাহাজ সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে ডুবে গিয়েছিল। সিন্দ্‌বাদ ও কয়েকজন সঙ্গী জাহাজ থেকে ভেসে পড়া কয়েকটা তক্তা নিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। এমনি সারাদিন। সারা রাত। ভাসতে ভাসতে পরেরদিন সকালে তক্তাসহ সিন্দ্‌বাদরা এসে পেঁছল একটা নির্জন দ্বীপে।
দূর থেকে এমনিতে নির্জন মনে হলেও আসলে সেই দ্বীপে ছিল অসংখ্য বেঁটে অসভ্য জংলী মানুষ। সিন্দ্‌বাদদের ভেসে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এল। হাতে তাদের বিষাক্ত তীর। কিন্তু তারা তীর ছুঁড়ে মারল না সিন্দ্‌বাদদের। আদর করে তাদের সবাইকে বাড়িতে নিয়ে চলল। যত্ন করে নানা জিনিষ খেতে দিল।
তার সঙ্গীরা তো খাবার পেয়েই হাউ হাউ করে খেয়ে ফেলতে লাগল। কিন্তু জংলীরা তাদের সঙ্গে খাচ্ছে না দেখে সিন্দ্‌বাদের কেমন সন্দেহ হল। না খেয়ে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়ার ভান করতে লাগল।
এদিকে সেই খাবার খাওয়ার পরে তার সঙ্গীরা প্রায় পাগলের মত হয়ে গেল। তারা শুধু হাসে। গানগায় অ র হাততালি দেয়। ওদের দেখাদেখি সিন্দ্‌বাদও তাই করতে লাগল। যাতে জংলীরা তাকে সন্দেহ না করে।
কিন্তু জংলীদের হাত থেকে সে তো বেঁচে গেল; এদিকে যারা তাদের সেসব খেয়েছিল তারা আর জংলীদের ঘর থেকে নড়তে চায় না। সারাদিন খায়দায়। আর সারা দিনই গান করে। হাততালি দেয়। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে সিন্দ্‌বাদের সঙ্গের লোকজনেরা হঠাৎ বেশ নাদুসনুদুস হয়ে পড়ল।

একদিন সকালে এরকম একজন নাদুসনুদুস চেহারার লোককে ধরে জংলীরা পুড়িয়ে খেল। পরের দিন আবার একজন। দেখে সিন্দবাদের ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরেরদিনই সঙ্গীদের মায়া কাটিয়ে সিন্দবাদ সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালাল।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছল একদিন সেই রাজ্যের নগরীতে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখানেই দেখল এ দেশের লোকেরা জিন আর রেকাব ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে ওঠে। ঘোড়ায় চড়ে।

একদিন খুব ভাল দেখে একজোড়া জিন আর রেকাব তৈরী করে সে গেল ওদেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে তাকে জিন আর রেকাবের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেগুলো উপহার দিল। রাজা তো জিন আর রেকাবসহ ঘোড়ায় চড়ে এত আরাম পেল যে সিন্দবাদকে বলল; যাও তুমি এদেশের সব ঘোড়ার জিন আর রেকাব বানিয়ে দাও।

জিন-রেকাব বানিয়ে তা বিক্রী করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল সিন্দবাদ। তার হাতে তখন প্রচুর পয়সা।

একদিন রাজা তাকে ডেকে বলল, এবার একটা বিয়ে কর। সিন্দবাদ তার কথা রাখল। ভাবল; কথা না রাখলে রাজা যদি রাগ করে!

নির্দিষ্ট সময়ে খুব সুন্দর দেখে ওদেশের একটি মেয়ের সঙ্গে সিন্দবাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বেশ সুখেই কাটছিল দিনগুলো!

হঠাৎ আচমকাই একদিন সিন্দবাদের জীবনে নেমে এল আবার চরম দুঃখ। কি এক অসুখে ভুগে মাত্র ক'দিনের ভেতরেই বৌটা

তার মারা গেল।

প্রথমে খুব কান্নাকাটি করল সিন্দবাদ। তারপর বৌকে কবর দিতে যাওয়ার আগেই এল রাজার আদেশ। বৌয়ের সঙ্গে তাকেও কবরে যেতে হবে। এদেশের নিয়ম—বৌ মারা গেলে তার সঙ্গে স্বামীকেও কবরে যেতে হয়।

শুনে চমকে উঠল সিন্দবাদ। রাজার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, মহারাজ আমি তো একজন বিদেশী। আমার বেলায়ও কী এই নিয়ম খাটবে!

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। গোঁপ নাচিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিল রাজা; তুমি আগে বিদেশী ছিলে। কিন্তু এদেশের মেয়ে বিয়ে করে এখন এদেশী হয়ে গেছো।

সিন্দবাদ বুঝল ভীষণ বিপদ। রাজার আদেশের একটুও নড়চড় হবে না। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে মনের দুঃখে বৌয়ের সঙ্গে কবরে চলল।

ওদেশের কবর বড় অদ্ভুত ধরণের। একটা পাহাড়ের মাঝখানে গর্তের মত বিশাল একটা খাদে খাটে করে মৃতদেহ দড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গর্তের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় বিশাল একটা পাথর। সিন্দবাদের বৌয়ের বেলায়ও তাই হল। বৌকে নামিয়ে সিন্দবাদকেও একই প্রক্রিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হল খাদের ভেতরে। তবে সে জীবিত বলে তাকে দেওয়া হল কয়েকটি বাসি রুটি ও এক কুঁজো জল।

খাদে নেমেই প্রথমটায় পচা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল সিন্দবাদের। পরে ওপরের গর্তের মুখের সামান্য আলো নিচে এসে পড়ায় দেখল, রাশি রাশি হাড়গোড় আর কঙ্কাল সেখানে। আর কঙ্কালের

পাশাপাশি অসংখ্য হীরে, পান্না; চুনী ছড়িয়ে আছে খাদের ভেতরে।

অন্য কোনো সময় হলে এগুলোই আগে সযত্নে পকেটে পুরে নিত কুড়িয়ে কাচিয়ে। কিন্তু এখন আর সেদিকে মন গেল না সিন্দ্‌বাদের। জানেই তো আর বেশিদিন নেই। বড়জোর দুদিন কি তিনদিন। তারপর তো সে মরেই যাবে। কাজেই এসব নিয়ে আর কি করবে সে!

ভাবতে ভাবতে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ যেন কি একটা জন্তু তার পেছন থেকে সাৎ করে সরে গেল। চমকে উঠল সিন্দ্‌বাদ। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল মনে। একটা জন্তু যখন এখান থেকে পালিয়ে গেল, তাহলে তো এই খাদ থেকে বেরোবার কোনো রাস্তা আছে!

এদিকে ওদিকে পরীক্ষা করতে করতে জন্তুটা যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে বেশ খানিকটা এগোতেই একটা বড় গর্ত নজরে পড়ল। অনেক কষ্টে সেখান দিয়ে গলে বেরিয়ে আসতেই সিন্দবাদ দেখল, সে সমুদ্রের পাড়ে এসে পড়েছে। জায়গাটা ভাল করে দেখে নিয়ে সেই গর্ত দিয়ে আবার ঢুকল সিন্দবাদ। এবার একটু আগে যে সব হীরে মণিমাণিক্য দেখে এসেছিল পাগড়িতে বেঁধে তাই নিয়ে বেরিয়ে এল সে। পরে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে একটা জাহাজ ধরে একদিন বাগদাদে ফিরে এল। আর দেশে ফিরে কবরখানায় সেইসব হীরে-জহরৎ বেচে সে লাভ করল লাখ লাখ টাকা।

সিন্দ্‌বাদ, আজব বুড়ো ও হারুণ অল রসিদের চিঠি

কবরখানা থেকে পাওয়া মণিমাণিক্য বেচে যে লাখ লাখ টাকা পেয়েছিল, সিন্দবাদ তাই দিয়ে এবার সে নিজেই একটা বড় দেখে জাহাজ কিনল। তারপর অনেক মালপত্তর কিনে জাহাজ বোঝাই করে অনেক লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার একদিন।

এবারে যাত্রা হল খুব নিরাপদ। আর জিনিসপত্র বেচাকেনা থেকে লাভও হল প্রচুর। সিন্দ্‌বাদের মনে প্রচুর আনন্দ। আনন্দ সঙ্গের সঙ্গী সাথীর মনে।

সেই আনন্দ নিয়েই সবাই মিলে ফিরছিল। ফেরার সময়ও সমুদ্র খুব শান্ত। কোথাও কোনো মেঘের আনাগোনা নেই। কোনো বিপদও নেই।

তবু বিপদ বাধল !

জাহাজ ফেরার সময় খুব সুন্দর একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে আসছিল। মনের আনন্দে সবাই সেই দ্বীপে নেমে একটু ঘুরে ফিরে দেখে যেতে চাইল। সিন্দবাদের ও ইচ্ছে ছিল না তা নয়। সঙ্গীদের কথায় সে ক্যাপ্টেনকে বলল জাহাজ ভেড়াতে।

জাহাজ থামতে সবাই নেমে পড়ল সেই দ্বীপে। ঘুরতে ঘুরতে জায়গাটা সবারই খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। সবাই তাই এদিকে ওদিকে নানা জিনিস দেখে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎই একজন চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকল।

—এই দেখে যাও। দেখে যাও। একটা রক পাখির ডিম ভেঙে ছানা বেরিয়ে আসছে।

এ কথা শুনে কেই বা না দেখতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সবাই। এমন কি সিন্দবাদ নিজেও না গিয়ে পারল না। দেখল, জঙ্গলের পাশে একটা রক পাখির ডিম। ডিমের এক কোণা ভেঙে রক পাখির ছানার একটা পা দেখা যাচ্ছে।

তখন তারা ডিম ফাটিয়ে রক পাখির ছানাটা বের করে কেটে ভোজ লাগাল। সিন্দবাদ অনেক বারণ করেছিল। কিন্তু আনন্দের উচ্ছ্বাসে কে কার কথা শোনে! তাছাড়া রক পাখির ছানা খাওয়া তো ভাগ্যের কথা!

কথা কারও কানে শুনল না। খেয়েদেয়ে ডিমের খোলসটা ফেলে রেখে সবাই তখন মনের সুখে আবার জাহাজে উঠল।

জাহাজ ছাড়ল যথাসময়েই। কিন্তু সিন্দবাদের মনে তবু ভয়। সে বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল সকলে। আকাশের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল; দুটো প্রকাণ্ড রক পাখি মস্ত বড় দুটো পাহাড়ের চাঁই পায়ে করে চেপে ধরে উড়ে আসছে জাহাজের দিকে।

সিন্দ্‌বাদ বুঝল; আর রক্ষে নেই। ওই বড় বড় পাহাড়ের
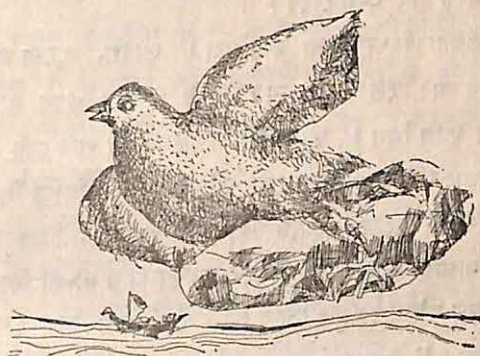
চাঁইগুলো জাহাজের ওপরে ফেললে আর দেখতে হবে না!

তাই হল। আকাশ অন্ধকার করে জাহাজের মাথায় উড়ে এসে পাথর দুটো ফেলল ঠিক জাহাজের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ উল্টে গেল। ভেঙে ডুবে গেল অতল জলে। কে কোথায় ছিটকে পড়ে যে তলিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই।

সিন্দ্‌বাদ বুঝতে পেরে আগে থেকেই একটা ডিঙি-নৌকা ঠিক করে রেখেছিল। তাতে চড়ে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনো রকমে ডাঙায় গিয়ে উঠল।

ডাঙায় উঠে এদিকে ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা ছোট নদী। জল খুব বেশি নেই। হেঁটেই পার হওয়া যায়।

পার হতে গিয়ে সিন্দবাদের নজরে পড়ল, নদীর পাড়ে এক থুথুরে বুড়ো বসে আছে। গায়ের চামড়া কোঁকড়ানো। থুতনিতে লম্বা দাড়ি। সিন্দবাদকে দেখে বুড়ো বলল, বাবা আমাকে একটু পার করে দেবে?

বুড়োর কথায় সিন্দবাদের দয়া হল। ভাবল, বুড়ো মানুষ। সাহস করে পার হতে পারছে না। তাই এগিয়ে এসে বুড়োকে সে কাঁধে তুলে নিল। তারপর অনায়াসে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে বুড়োকে নামিয়ে দিতে গেল কাঁধ থেকে। কিন্তু সিন্দবাদ নামাতে যেতেই বুড়ো দুমদুম করে সিন্দবাদকে কিল মারতে লাগল; মাথার চুল ধরে টানতে লাগল আর দু-পা দিয়ে তার গলাটা এমন সাঁড়াশির মত চেপে ধরল যে বাধ্য হয়ে সিন্দবাদ তাকে নিয়ে হাঁটতে থাকল।

কিছুটা গিয়ে আবার ঘাড় থেকে নামাতে গেল বুড়োকে। কিন্তু আবারও সেই অবস্থা। সিন্দবাদ দেখল এ তো মহাজ্বালা! বুড়ো যে ঘাড় থেকে নামতেই চায় না।

কি আর করে! উপায় না দেখে ওকে নিয়েই হাঁটতে থাকে। একবারও থামার উপায় নেই। থেমে কোথায়ও বসে একটু জিরোবার উপায় নেই। থামলেই কিলচড় লাগিয়ে অস্থির করে সিন্দবাদকে।

এমনি করেই কয়েকদিন কাটাবার পর সিন্দবাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। একটা খালি চাল-কুমড়োর খোল জোগাড় করে, তার মধ্যে কিছু আঙুরের রস তৈরী করে পচাল, যা খেলে খুব

নেশা হয়। একদিন সেই রস বুড়োকে দেখিয়ে একটু মুখে দিতেই বুড়োটা সিন্দ্‌বাদের হাত থেকে সেই খোলটা কেড়ে নিয়ে ঢক ঢক করে সব রসটা খেয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নেশা হয়ে গেল। অমনি সিন্দ্‌বাদ বুড়োকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েই দৌড় লাগালো।

দৌড়তে দৌড়তে সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছিল। সিন্দ্‌বাদের নজরে পড়ল, সেখানে একটা জাহাজ নোঙর করা রয়েছে। আর জাহাজের লোকজনেরা সমুদ্রের পাড়ের নারকেল গাছগুলোকে টিপ করে পাথরের টুকরো ছুঁড়ছে। নারকেল গাছগুলোর মাথায় অনেক বাঁদর বসেছিল। পাথরের টুকরোগুলো তাদের গায়ে লাগায় তারাও পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে নারকেলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ছুঁড়ে মারছিল।

দেখাদেখি সিন্দ্‌বাদও ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। নিচ থেকে পাথর কুড়িয়ে টিপ করে মারতে লাগল বাঁদরগুলোকে। এমনি করে অসংখ্য নারকেল জড়ো হওয়ার পর সে নারকেল জাহাজে তুলে রওনা হল ওরা। সিন্দ্‌বাদও তাদের সাহায্য করেছে বলে তাকেও সঙ্গে নিল তারা।

সে যাত্রায় নারকেল বিক্রীর টাকার ভাগ সিন্দ্‌বাদও বড় কম পেল না। তাকে বাগদাদ শহরে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ চলে গেল।

কিছুদিন পরে লোকজন নিয়ে আবার বেরোল সিন্দ্‌বাদ। তবে এবার আর জাহাজে নয়, সমুদ্রপাড় ধরে হাঁটা-পথ ধরল তারা। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর এক চেনা সওদাগরের দল দেখে, কি মনে করে, তাদের জাহাজে চড়ে বসল।

এরপর বরাবর যা হয়, তাই হল আচমকা একদিন। ঢেউয়ের টানে এক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ গেল ভেঙে। কোনো রকমে সাঁতরে সিন্দবাদরা পাহাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচল। খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখল, সেই পাহাড়ের এক কিনারে ভাঙা জাহাজের টুকরো আর অসংখ্য কঙ্কাল; হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে। সিন্দ্‌বাদ বুঝল; এসব ওদের মতই কোনো জাহাজের হতভাগা নাবিক আর সওদাগর। জাহাজডুবির পর এখানে এসে উঠেছিল। কিন্তু প্রাণে বাঁচেনি।

এসব দেখেশুনে খুব ভয় হল এদের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলল ওরা সেই পাহাড় পার হয়ে। কিন্তু যতই যায়, ততই দেখে পাহাড়ের চারদিকে শুধু দামী হীরে জহরৎ ছড়িয়ে আছে। আর তার ওপর রোদ ঠিকরে পড়ে যেন গোটা পাহাড়টাই ঝকঝক করে উঠেছে।

তবে সেদিকে তেমন কারো নজরই নেই। সবাই এখন একটুকরো রুটি আর জলের খোঁজে চারপাশে তাকাচ্ছে।

এরই মধ্যে সিন্দ্‌বাদের নজরে পড়ল; এক পাহাড়ি নদী পাহাড়ের এক গুহার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ভাবল, নদীর স্রোত যখন গুহার ভেতর ঢুকছে তখন নিশ্চয়ই কোথায়ও না কোথায়ও গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। মাথা খাটিয়ে একটা ভেলা বানিয়ে সিন্দ্‌বাদ তাতে চড়ে বসল। উঠার আগে একটা পোঁটলার মধ্যে যত পারে হীরে-জহরৎ বেঁধে নিল ; তার বন্ধুরা এই ভয়ংকর যাত্রায় যেতে রাজী হল না। অগত্যা সিন্দ্‌বাদ নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভেলা ভাসাল নদীর জলে। আর বন্ধুরা পাহাড়ী পথ ধরেই এগোতে লাগল।

কতক্ষণ পরে মনে নেই। গুহার ছাদটা খুব নীচু হতে থাকায় ভেলার ওপরেই শুয়ে পড়েছিল সিন্দবাদ, আর ওভাবে ভাসতে ভাসতেই একসময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। ঘুম ভাঙল অনেকক্ষণ পরে। তখন গুহার ভেতরের সেই জমাট অন্ধকার নেই। চারদিকে ঝলমলে আলো। আর ভেলাটাও ঠেকেছে এসে অজানা এক দেশের পাড়ে।

সিন্দবাদ তাকিয়ে দেখল; তাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। তারা সিন্দবাদকে বিদেশী লোক মনে করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে নিয়ে গেল।

সে দেশের রাজা খুব ভাল মানুষ। সিন্দবাদের পরিচয় পেয়ে বলল, তোমাদের বাগদাদের বাদশা হারুণ-অল-রসিদের নামী শুনেছি অনেক। ভালই হল তুমি যখন এসেছো; এখন তোমাদের রাজার জন্য আমি সামাণ্য উপহার দেবো—তুমি তা নিয়ে যাও। এই বলে সেই রাজা এক জাহাজ ভর্তি হীরে-জহরৎ আর অসামান্য সব সুন্দর উপহার দিয়ে একটা চিঠিও দিল সিন্দবাদকে; হারুণ-অল-রসিদকে দেওয়ার জন্য।

বাগদাদে ফিরে সেসব নিয়েই হারুণ-অল-রসিদের সঙ্গে দেখা করল

সিন্দ্‌বাদ।

বাদশা তো এসব দেখে খুব খুশি। খুশি হয়েই সিন্দবাদকে অনেক ধন দৌলত উপহার দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ডেকে পাঠালেন তাকে। বলল, দেখ আমাকে যিনি এত উপহার পাঠালেন তাকেও তো একবার কিছু পাঠাতে হয়! কাজেই আমার ইচ্ছে এই উপহার নিয়ে তুমি যাও। আর তুমি ছাড়া সে দেশের রাস্তাও তো কেউ চেনে না।

অগত্যা আবার বেরোতে হোল।

ঠিক সময়েই সে দেশের রাজার হাতে বাদশা হারুণ-অল-রসিদের চিঠি আর উপহারসামগ্রী তুলে দিল সিন্দ্‌বাদ। বলাই বাহুল্য সে দেশের রাজাও তাতে যারপরনাই খুশী হলেন। সিন্দ্‌বাদকেও আবার অনেক ধন দৌলত উপহার দিলেন।

কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আবার বাগদাদের দিকে রওনা হল সিন্দ্‌বাদ। কিন্তু ফেরার সময় হঠাৎ একটা বিপদ দেখা দিল। আচমকা জলদস্যুরা এসে তার ধন দৌলত আর জাহাজ লুট করে নিল। শুধু তাই নয় সিন্দ্‌বাদকে নিয়ে তারা বন্দী অবস্থায় আর এক সওদাগরের কাছে বিক্রী করে দিল।

সেই সওদাগরের ছিল হাতীর দাঁতের ব্যবসা। জঙ্গলে গিয়ে হাতী মেরে তার দাঁত আর হাড়গোর নিয়ে বেচত। সিন্দ্‌বাদকেও সেই কাজে লাগিয়ে দিল সওদাগর।

সওদাগরের কথামত জঙ্গলে গিয়ে একদিন সিন্দ্‌বাদ একটা গাছে উঠে বিষের তীর হাতে নিয়ে বসে রইল। হাতীর দেখা পাওয়া মাত্র সেই তীর ছুঁড়ে একটা হাতীকে মারল।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল সওদাগর। মরা হাতীর দাঁতটা

কেটে নিয়ে, বিশাল একটা গর্ত করে হাতীটাকে সেখানেই মাটিচাপা দিয়ে রাখল। পরে হাড়গোরগুলো তুলে নেবে বলে।

পরেরদিন সওদাগর আবার তাকে জঙ্গলে পাঠাল। কিন্তু এবার ঘটল এক বিপদ। যে গাছে উঠে বিষের তীর নিয়ে বসেছিল সিন্দবাদ, হঠাৎ সেই গাছটাকে এসে ঘিরে ধরল হাতীর দল। তারপর সিন্দবাদকে কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে একটা বড় হাতী এগিয়ে এসে শুঁড় দিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর গাছটা উপড়ে নিয়ে ছুটতে থাকল।

সিন্দবাদ ভাবল, এই যে এবার গেলাম! এবার হাতীটা বুঝি এক আছাড়ে তাকে মেরে ফেলবে।

হাতীরা কিন্তু ওকে কিছু বলল না। অনেকটা ভেতরে গিয়ে গভীর জঙ্গলের এক জায়গায় ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। সামনে তাকিয়ে সিন্দবাদ অবাক হয়ে গেল। তার চারপাশে পাহাড়ের মত জমা হয়ে আছে অসংখ্য মরা হাতীর কঙ্কাল আর দাঁত।

সে বুঝল, এটা হাতীদের কারখানার মতো একটা কিছু। যেখানে সব হাতীর লাশগুলো এনে জমা করা হয়। হাতীগুলো যে এখানে তাকে নিয়ে এল, তার কারণ, বোধহয়, ওরা বোঝাতে চাইছে—শুধু শুধু আমাদের মারছো কেন? আমাদের কঙ্কাল আর দাঁত চাই তো? তা কত নেবে নাও না এখান থেকে।

সিন্দবাদ আর দেরী করল না। সে তখন দৌড়ে গিয়ে সওদাগরকে খবর দিল।

দেখে তো সওদাগরের চোখ কপালে ওঠে আর কি! তাজ্জব ব্যাপার! এত হাতীর দাঁত আর কঙ্কাল এখানে পড়ে রয়েছে;

অথচ তার খবরই জানে না সে। এখানে যা জিনিষ আছে, তা বেচে তো আমি কোটিপতি হয়ে যাবো। একবারে রাজা বনে যাবো। তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো—

ফাঁক বুঝে সিন্দবাদ বলল, তাহলে আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

সওদাগর বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে শুধু হাতে তো ছাড়া যায় না। তুমি এক কাজ কর। আমি তোমাকে একটা জাহাজ দিচ্ছি। সে জাহাজ ভর্তি করে তুমি যতো পারো এই হাতীর দাঁত নিয়ে যাও।

সিন্দবাদকে তখন আর পায় কে! চটপট সওদাগরের দেওয়া জাহাজে প্রচুর হাতীর দাঁত তুলে নিয়ে সে রওনা হল নিজের দেশে। রাস্তায় সে দাঁত বিক্রী করে পেল লাখ লাখ টাকা। তারপর একদিন সে টাকা নিয়ে মহানন্দে ফিরে এল বাগদাদে।

দেশে ফিরেই বাদশা হারুণ-অল-রসিদের সঙ্গে দেখা করল সিন্দবাদ। সমস্ত ঘটনাটা বলল একে একে।

বাদশা খুশি হয়ে আবার অনেক ধন দৌলত উপহার দিলেন তাকে।

কিন্তু সিন্দবাদ সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করল আর জলপথে বাণিজ্য করতে যাবে না সে। জলপথে অনেক বিপদ। তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল। যদি যেতেই হয় হাঁটা পথে এবার বেরোবে সে।

জেলে-জেলেনী, বেটা মহম্মদ সবুজ দেশের শাহজাদী

এক জেলে তার সুন্দরী বউকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এক নির্জন জায়গায় বাস করত। অবস্থা তাদের ভাল নয়। দিন আনে দিন খায়। তবুও তারা সুখী। কারণ বউটি তার বড় ভাল—যেমন রূপে, তেমনি গুণে। জেলে সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরে। সেই মাছ বিক্রী করে ঘরে যা আনে, জেলেনী তাই দিয়ে সংসার চালায়। এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ একদিন জেলের হল অসুখ। শরীরে শক্তি নেই তাই জাল ফেলতেও যেতে পারল না সেদিন। ফলে খাওয়া দাওয়াও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

সেদিনটা তো কোনোরকমে গেল। পরের দিন ভোরে উঠে

জেলেনী জেলেকে বলল; তুমি যদি জাল ফেলতে না যাও তাহলে আমাদের প্রাণ বাঁচবে কি করে? তার চেয়ে এক কাজ কর। তুমি যদি একটু কষ্ট করে উঠে আমার সঙ্গে যাও তাহলে আমিই না হয় জালটা ফেলব। তুমি দেখিয়ে দিও। বলে জাল আর চুপড়ি হাতে তুলে নিল জেলেনী।

বউয়ের কথায় রাজী হল জেলে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সমুদ্রের ধারে যেদিকটায় সুলতানের প্রাসাদ সেদিকে হেঁটে গেল। ওদিকে যাওয়ার কারণ; একবার জাল ফেললেই অনেক মাছ পাওয়া যাবে। ওদিকটা মাছের আনাগোনা বেশি। জেলে ভাবল, দুটো তো মোটে পেট। কাজেই ওদিকে গেলে বার দুয়েক জাল ফেলে জেলেনী যা মাছ পাবে তাই বিক্রী করে দুজনের দিব্যি চলে যাবে। তাহলে বেশি খাটতে হবে না বউকে।

হাঁটতে হাঁটতে যে সময়ে ওরা সুলতানের প্রাসাদের সামনে হাজির হল, সুলতান তখন তাঁর প্রাসাদে জানলার ধারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ জেলের বউকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। ভাবলেন, হায়রে! আল্লার দুনিয়ায় এত সুন্দরও জেনানা হয়!

তখনই ডেকে পাঠালেন তিনি উজীরকে।

উজীর এলে বললেন; দেখ উজীর, সমুদ্রের ধারে ওই যে জেলেনী যাচ্ছে; ওর সঙ্গে গিয়ে এখুনি কথা বল। আমি ওকে শাদী করতে চাই। আমার হারেমের বিবি করে রাখব ওকে।

উজীর বললেন, তা কি করে হয় জাঁহাপনা! ওর যে মালিক আছে—ওই জেলে। কাজেই জেলে থাকতে—

—তাহলে এক কাজ কর—উজীরকে বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন সুলতান, কোনো সেপাই পাঠিয়ে জেলেটাকে মেরে ফেল। তাহলেই তো আর বাঁধা থাকে না—

—না, তা হয় না জাঁহাপনা। তাহলে আপনার অন্যায় করা হবে। এটা তো বে-আইনী। ওর কোনো দোষ না পেলে আপনি ওকে মারবেন কোন যুক্তিতে!

—তাহলে! তবে কি করা যায় বল তো উজীর?

একটু ভেবে উজীর জানালেন, জাঁহাপনা আপনার দরবার ঘরের মাপটা তো আপনার জানাই আছে। একবারে বিঘে তিনেক জমির ওপরে তৈরী। আমি বরং জেলেকে ডেকে এনে বলি, সুলতানের এই দরবার ঘরের মেঝে তোকে একটা মাত্র গালিচা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে তোকে। না পারলে তোর গর্দান নেওয়া হবে। আর বুঝতেই পারছেন, জেলের পক্ষে এটা হবে অসম্ভব ব্যাপার। আর সেই অজুহাতে ওকে আপনি অনায়াসেই হত্যা করতে পারবেন। কেউ কিছু বলতে পারবে না।

—বাহ বাহ খাসা বুদ্ধি বার করেছো তো উজীর। ঠিক আছে তাই কর।

উজীরের প্রশংসা করতে করতে সুলতান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পরের দিনই দরবার ঘরে জেলেকে ডেকে পাঠালেন উজীর। সে এলে তাকে বললেন, শোন হে এই যে দরবার ঘরটা দেখছো, এই পুরো ঘরটা তোমাকে একটানা বোনা একখানা গালিচা এনে ঢেকে দিতে হবে। এটা সুলতানের আদেশ। তার জন্য তোমাকে অবশ্য তিনি তিনদিন সময় দিচ্ছেন। তার মধ্যে না পারলে পুড়িয়ে মারা হবে তোমাকে। আর তার জন্য এখুনি একটা

চুক্তিনামায় সই করতে হবে তোমাকে। বুঝলে ?

জেলে বলল, বুঝলাম হুজুর। কিন্তু আপনারা আমাকে গালিচাওয়ালা ভাবলেন কি করে ? আমি তো একজন জেলে। তার চেয়ে আপনি যদি আমাকে মাছের কথা বলেন তো দিতে পারি। তাহলে আমি এখুনি চুক্তিনামায় সই করে দিচ্ছি।

উজীর সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন, থামো—থামো—অনেক হয়েছে। বাজে কথা না বলে যা বললাম এখন, তাই কর। মনে রেখো এটা সুলতানের হুকুম। নাও চুক্তিনামায় লিখে এখনই সই করে দাও।

কথা শুনে জেলের মত অত শান্ত লোকও উঠল রেগে। বলল, ওসব আপনারা লিখুন, সই করুন। আমি কিছুই করতে পারবো না—বলে খুব তাড়াতাড়ি সুলতানের প্রাসাদ ছেড়ে চলে এল সে।

বাড়িতে ফিরলে জেলেনী তার মুখ গম্ভীর দেখে কি হয়েছে জানতে চাইলে জেলে তাকে সব কথা খুলে বলল।

বউ শুনে বলল, শুধু এই। আর তো কিছু নয় ?

—না। জেলে মাথা নাড়ল।

—তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। এরকম গালিচা কালই তোমায় এনে দিচ্ছি আমি। তুমি গিয়ে সুলতানের দরবার ঘরে শুধু পাতবে—ব্যাস !

বউয়ের কথা শুনে জেলে বলে উঠল, তোমারও দেখছি উজীরের মত মাথা খারাপ হয়েছে।

—কি বললে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে ! আচ্ছা চল এক্ষুণি তোমাকে গালিচা যোগাড় করে দিচ্ছি। এবার যা বলছি মন দিয়ে

শোন। তুমি আমাদের ওই বাগানে চলে যাও। গিয়ে কুঁয়োর পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে আমি যার নাম বলছি তাকে ডেকে বলবে; তোমার পেয়ারের সহেলি (সখি) তোমায় সেলাম জানিয়ে বলে পাঠিয়েছে কাল যে টাকুটা নিতে ভুলে গিয়েছিল সেটা দিতে। একটা ঘরের মেঝেয় একটা গালিচা বুনবার দরকার হয়েছে আমাদের।

শুনে জেলে বলল, ঠিক আছে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

জেলেনীর কথামত তারপর বাগানে গিয়ে জেলে কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে যেই না কথাগুলো বলেছে, অমনি ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে কে যেন একটা টাকু জেলের দিকে ছুঁড়ে দিল। জেলে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জেলেনীর কাছে ফিরে এসে বলল, এই নাও তোমার টাকু।

টাকু পেয়ে এবার জেলেনী তাকে বলল; এনেছ বেশ। এবার শোন। এটা হাতে নিয়ে তুমি উজীরের কাছে যাও। গিয়ে বল, আমায় একটা বড় গজাল পেরেক দিন। উজীর পেরেক দিলে পেরেকটা তুমি দরবার ঘরের একপাশে পুঁতবে, পুঁতে টাকুর সুতো তাতে বাঁধবে। বাঁধা হয়ে যাওয়ার পর তুমি ওখান থেকে সরে দাঁড়ালেই গালিচা বিছানো হতে থাকবে।

কিন্তু বউয়ের কথাগুলো কেমন যেন আজগুবি মনে হল জেলের। সে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই হবে তো। নাকি লোকে আমায় দেখে খিল খিল করে হাসবে। পাগল বলবে।

জেলেনী এবার রেগে গেল।

—চুপ কর তো তুমি। যা বলছি তাই কর গিয়ে।

এরপর আর কি করবে বেচারা জেলে—টাকুটা নিয়ে সুলতানের

প্রাসাদে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

প্রাসাদে পেঁছতেই উজীর জিজ্ঞেস করল, কি হে গালিচা কোথায় ?

জেলে সেসবের কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, আমাকে একটা গজাল পেরেক দিন তো আগে ?

—গজাল পেরেক দিয়ে কি করবে তুমি ?

—আহা দিন না তারপর সব বলছি।

উজীরের আদেশে একজন পেরেক এনে দিলে, জেলে সেটা নিয়ে দরবার ঘরের এক কোনায় পুঁতল সাবধানে। তারপর তাতে টাকুর সুতা বেঁধে দিয়ে সরে আসতেই দেখতে দেখতে চমৎকার একটা গালিচা পাতা হয়ে গেল সারা দরবার ঘরে।

উজীরের তো চোখ ছানাবড়া। সুলতানও তাজ্জব বনে গেলেন। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বেরোল না তাদের মুখ দিয়ে। বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটলে উজীর সুলতানের দিকে তাকিয়ে কি একটা ইশারা করার পর জেলেকে বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। সুলতান খুশি হয়েছেন তোমার কেরামতি দেখে। কিন্তু এখন আর একটা ফরমাস আছে তোমার কাছে। তুমি সুলতানের সামনে আটদিন বয়সের একটি বাচ্চা আনবে। আর সেই বাচ্চা সুলতানের সামনে এমন একটা গল্প বলবে যে গল্পের আগাগোড়াই মিথ্যে।

শুনে জেলের মাথায় আবার যেন বাজ পড়ল।

দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে গেল সে। ঘরে পা দিয়েই বউকে বলে উঠল, নাও এবার তল্পি-তল্পা বাঁধো। এ দেশে আর থাকা যাবে না। আমি তখনি তোমাকে বলেছিলাম, শুনলে না তো তুমি !

—কেন কি হয়েছে কি ? শুনে বউ বলল, টাকু থেকে গালিচা বেরোয়নি ?

হ্যাঁ তা বেরিয়েছে। বলে জেলে নতুন ফরমাসটার কথা জানিয়ে বলল, এবার ওরকম একটা বাচ্চা যোগাড় করতে না পারলে গর্দান যাবে। আর এজন্য আমাকে মাত্র আটদিন সময় দিয়েছেন সুলতান।

—আটদিন ! সে তো অনেক সময় ! ঠিক আছে এ নিয়ে আর ভেবো না তুমি ? সময় মত সবই হয়ে যাবে।

বউয়ের কথায় জেলে এবার পুরোপুরি ভরসা পায়। আর এমনি করেই এর পর সাত-সাতটা দিন কেটে যায়। আটদিনের দিন বউ তাকে সুলতানের ফরমাসটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে, কি গো সুলতানের ফরমাসটার কথা ভুলে গেলে না কি ? বাচ্চাটা নিয়ে যাবে না দরবারে ?

—যাবো না মানে ! বউয়ের কথায় লাফিয়ে উঠে জেলে বলে, কই কি করবো বল ?

জেলেনী বলে, যাও বাগানে গিয়ে কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে আগের

মতই আবার সহেলীকে ডাক। সহেলী সাড়া দিলে তাকে মিষ্টি কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে টাকুটা ফেরৎ দাও। তারপর আমার অনুরোধ জানিয়ে তাকে বল, কাল তার যে ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাকে একবার আমাদের কাছে পাঠাতে। খুব বিশেষ প্রয়োজন!

কথাটা শুনে জেলে অবাক হয়। সুলতান বলেছেন আটদিনের বয়সী বাচ্চা চাই। আর বউ তা থেকে অনায়াসে আরো সাতদিন কমিয়ে দিল। তার মানে বাচ্চাটার বয়স দাঁড়াবে এক-দিন। কিন্তু একদিনের বাচ্চা কি করে কথা বলবে? তাও আবার আগাগোড়া একটা মিথ্যে গল্প বানাতে হবে।

বউ বুঝেছিল, জেলের মনে সন্দেহ হচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি বলল, তোমাকে যা বললাম বিশ্বাস নিয়ে তাই কর তো।

জেলে এবার আর দেরী করে না। চটপট কুয়োর কাছে গিয়ে বউয়ের শেখানো কথাগুলো বলতেই কুয়োর মধ্যে যে ছিল, সে বলে উঠল, এই নাও সে ছেলে। আল্লার দোয়া মেঙো। কেউ যেন এর দিকে কুনজর না দেয়। এই বলে জেলের সামনে ছেলেটাকে বাড়িয়ে ধরতেই জেলে 'আল্লা মেহেরবান—'বলে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল।

এরপর তাকে নিয়ে বউয়ের কাছে আসতেই বউ বলল, যাও এবার ওকে নিয়ে সুলতানের দরবারে যাও। গিয়ে ওর জন্যে তিনটে সুন্দর তাকিয়া চেয়ে নিও। তাকিয়া পেলে একটা বিছানায় শুইয়ে ওকে, ওর দুপাশে দুটো আর পেছনে একটা তাকিয়া দিয়ে দিও। তারপর দেখো কি হয়!

মনে মনে সাহস আর ভরসা দিয়ে এরপর ছেলেটাকে নিয়ে রওনা

হল জেলে।

দরবারে যখন পেঁছাল তখন রোদ উঠে গেছে। সুলতান, উজীর, আমীর, ওমরাহরা সকলেই দরবারে হাজির।

জেলেকে দেখেই উজীর বলল, কি হে এনেছো ? কই দেখি দেখি —বলে বাচ্চাটাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর বাচ্চাটার সামনে কথা বলতে গেলে বাচ্চাটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

উজীরের আনন্দ আর দেখে কে তখন! মহানন্দে সুলতানের কাছে গিয়ে বলল সে, জাঁহাপনা এবার জেলের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ বাচ্চা গল্প বলবে কি আমি কথা বলতে গেলাম অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। নিন জাঁহাপনা সবাইকে এবার তাহলে আসতে বলি। জল্লাদকেও তৈরী হতে বলি।

সুলতান মাথা নাড়তেই উজীর সবাইকে আসতে বলল দরবারে। সবাই এলে উজীর এবার তার সীলকরা চুক্তিনামা পড়ে শোনাল সবাইকে। এও জানাল; জেলে তার চুক্তি না রাখলে এখানেই তার মুণ্ডু কেটে নেওয়া হবে। তারপর জেলের দিকে ফিরে সে বলল; কই হে নাও—তোমার ছেলেকে বল গল্প বলতে।

জেলে সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের কথামত তিনটে তাকিয়া চেয়ে, তাকিয়া সাজিয়ে ছেলেটিকে তার ভেতরে বসিয়ে দিতেই সুলতান বলল; কি হে এলেমদার বেটা এমন একটা গল্প বল তো যার আগাগোড়াই মিথ্যে কথায় ভরা।

সুলতানের কথা শেষ হতেই সবাইকে চমকে দিয়ে বাচ্চাটা পরিষ্কার গলায় সুলতানকে সেলাম জানাল।

সুলতানও পাল্টা সেলাম জানাতে বাচ্চাটা বলতে শুরু করল-- আমি তখন যুবক। একবার এক গ্রীষ্মের বিকেলে গরমে ছটফট করতে করতে অস্থির হয়ে পড়লাম। একটু পরেই মনে হয় ফাঁকা মাঠে ঘুরলে হয়ত আরাম লাগবে। তাই শহর থেকে মাঠে বেড়াতে বেরোলাম। গরমে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। একটা লোকের কাছ থেকে একটু পরে এক দিনার দিয়ে একটা তরমুজ কিনলাম। সবে তা থেকে একফালি কেটে খেয়েছি, এমন সময় সেদিকে তাকিয়ে দেখি, কাটা তরমুজের মাঝখানে মস্ত একটা শহর। দেখে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। একদম লাফিয়ে পড়লাম সেই তরমুজের ভেতরে। ভাবলাম, একবার শহরটা ঘুরে দেখি। ঘুরতে ঘুরতে দেখি কত ঘরবাড়ি। কত দোকান। কত লোকের কেনা বেচা। ঘুরে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে শহর ছেড়ে এসে পড়লাম শহরতলীতে। তারপর বড় একটা

মাঠে। মাঠে পড়তেই দেখি; আমার সামনেই একটা খেজুর গাছ। তাতে ইয়া বড় বড় সব খেজুর। খিদে পেয়েছিল খুব। গাছে উঠে ওই খেজুর পারতে গিয়েই দেখি; কতগুলো চাষী ওই খেজুরের মধ্যে বীজ ছড়াচ্ছে। ধান ভানছে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি; একটা লোক পাটাতনের ওপর ডিম আছরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বেরিয়ে যাচ্ছে। মোরগগুলো যাচ্ছে একদিকে। মুরগীগুলো আর একদিকে। আমি মোরগ আর মুরগীগুলোর শাদী দিয়ে দিলাম। এরপরেই আমি আর একটা ডালে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি একটা গাধা। পিঠে তার এক ঝুড়ি তিলের পিঠে। এই পিঠে খেতে আমি বড় ভাল বাসি। তাই তক্ষুণি একটা পিঠে নিয়ে খেয়ে ফেললাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমি কখন তরমুজের বাইরে এসে গেছি। অমনি তরমুজটাও বন্ধ হয়ে গেল। নিন; এই আমার গল্প জাঁহাপনা—

নবজাত এক শিশুর মুখে এই গল্প শুনে দরবারের সবাই ততক্ষণে চমকে উঠেছে। সুলতান তো তাজ্জব। আর উজীরের মুখে তো কোনো কথাই নেই।

একটু পরে সুলতানই প্রথম কথা বলে উঠল, দেখো এলেমদারের বেটা—তুমি যা বললে; তার সবটাই তো বানানো। না হলে যা বললে তা তো সত্যি হতে পারে না। স্বীকার কর এসব সত্যি নয় ?

ছেলেটি এবার বলে উঠল, জাঁহাপনা আমার স্বীকার অস্বীকারের আগে আপনি সবার সামনে স্বীকার করুন তো আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন ? জেলের বউকে পাওয়ার লোভে আপনি নানা ছলে

এই জেলেকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। এই কি আপনার সুলতানের মত ন্যায্য কাজ! যাই হোক; আমি আল্লার নামে শপথ নিয়ে বলছি—এখন থেকে আপনি যদি এই জেলে পরিবারকে নিশ্চিন্তে আর শান্তিতে থাকতে না দেন, তাহলে আমি উজীর ও আপনার এমন দশা করব যে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না আপনাদের।

বলা বাহুল্য, সুলতান এরপরে ভয় পেয়ে গেলেন। উজীরের মুখ দিয়েও কোনো কথা সরল না। আর বাচ্চাটারই নির্দেশ মত তাকে কোলে নিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল জেলে। কেউ বাধা দিতে সাহসও পেল না।

এরপর সুলতান কিছুদিন আর তাদের উপর উপদ্রব করতে সাহস পেলেন না। কিন্তু ঝামেলা শুরু হল আবার বেশ কিছুদিন পরে।

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। জেলে আর জেলেনীর একটি ছেলে হয়েছে। কুয়োর ভিতর থেকে উঠে আসা যে রহস্যময় শিশু একদিন জেলের জীবন বাঁচিয়েছিল, তার কথা স্মরণ করেই জেলে জেলেনী তার নাম রাখলেন এলেমদার মহম্মদ।

মহম্মদ তার মায়ের মতই দেখতে হয়েছে সুন্দর। আর ব্যবহার তার তেমনি চমৎকার। ঠিক এই সময় সুলতানের একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু দেখতে সে অতি কদাকার। কুৎসিত। তার মুখের দিকে চোখ পড়লে যে কেউই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পড়াশোনা করার বয়স হলে সুলতান তাকে মক্তবে এক মৌলভীর কাছে ভর্তি করানোর নির্দেশ দেন। সেই মক্তবে সেই মৌলভীর কাছে জেলের ছেলে এলেমদার মহম্মদও ভর্তি হয়েছিল। আস্তে আস্তে দেখা গেল; সুলতানের বেটার পড়াশোনায় মন নেই। রীতিমত কুঁড়ে সে। আর জেলের ছেলে; লেখাপড়ায় খুবই উৎসাহ। বুদ্ধিও রাখে প্রচণ্ড। ফলে দেখতে দেখতে সুলতানের বেটা পড়ে রইল নিচু ক্লাসে। আর এলেমদার মহম্মদ স্থান পেল উঁচু ক্লাসে।

কিন্তু হলে হবে কি! সে জেলের ছেলে বলে সুলতানের বেটা বেশ ব্যাঙ্গের সুরে তাকে রোজ ঠাট্টা করে। বলে, সেলাম জেলের বেটা। অবশ্য প্রতিউত্তর দিতেও জেলের ছেলে কম যায় না। জানায়; ও সুলতানের বেটা—পুরনো খড়মের ফিতের মত তোমার কালো মুখ ফরসা হোক।

শুনে সুলতানের বেটার গা জবালা করে। একদিন সে জেলের ছেলেকে যাচ্ছেতাই অপমান আর গালাগাল করল। জেলের ছেলেও যখন পাল্টা দুচারকথা শুনিয়েছে তাকে, তখন তা সহ্য করতে না পেরে সরাসরি সুলতানের কাছে এসে নালিশ করল এলেমদার মহম্মদের নামে।

সুলতান শুনে তো রেগে আগুন। কি—জেলের ছেলের এতদূর সাহস! কিন্তু সুলতান যতই রেগে যান, আগের কথা মনে আছে

তার। তাই নিজে শাস্তি দিতে পারবেন না জেনে মক্তবের মৌলভীকে ডেকে পাঠালেন।

মৌলভী এলে বললেন, শোন শেখ, এই জেলের বেটা মহম্মদকে যদি তুমি মেরে ফেলতে পারো, তাহলে অনেক পুরস্কার দেব তোমাকে। অনেক টাকা-পয়সাও মিলবে।

মৌলভী রাজী হয়ে পরের দিনই মহম্মদের পায়ের তলায় এমন লাঠির বারি মারল যে মারের চোটে বেচারার পা দিয়ে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করল। যন্ত্রণায় ছেলেটা চেঁচাতে লাগল। মৌলভী মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে বলল, ক্ষুদে শয়তান—আজ ছাড়া পেলি। কাল আবার তোকে এমনি মারব।

মহম্মদ ছাড়া পেয়েই জখম পা নিয়েই ছুটল বাড়ীর দিকে। বাবা-মাকে চোট পাওয়া পা-টা দেখিয়ে বলল, দেখ তোমরা, আমার পায়ের কি অবস্থা করেছে মৌলভী। আর একটু হলেই আমি মরে যেতাম।

বলে সব ঘটনা খুলে বলল জেলে-জেলেনীকে। তারপর বলল, আর আমি মক্তবে যাবো না। কাল থেকে জাল নিয়েই সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবো। জেলের ছেলে জেলের মতই মাছ ধরব। দরকার নেই আমার লেখাপড়ায়।

কথাটা জেলে-জেলেনীরও মনে ধরল। তাছাড়া ভয় ছিল, মক্তবে গেলে যদি ছেলেটাকে মেরে ফেলে। তাই তারা বলল, ঠিক আছে তাই কর তুই। সমুদ্রেই জাল দিয়ে মাছ ধর। এই করেই ঠিক বেঁচে থাকতে পারবি।

পরদিন ভোরে জেলের ছেলে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে বেরোল মাছ ধরতে। প্রথমবার জাল ফেলতে তার জালে

উঠে এল ছোট্ট একটা লাল মুলেট। মুলেট হল এক ধরণের সামুদ্রিক মাছ। মাছটা দেখে মহম্মদ ভাবল, যাক একটা মাছ যখন উঠেছে তখন এটা ভাজা করেই সকালের খাবারটা হয়ে যাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ঘরে ফিরে উনুনে আগুন দিয়ে যেই মাছটা ভাজতে যাবে, অমনি সেই মাছটা মানুষের মত গলায় বলে উঠল, না—না মহম্মদ তুমি আমায় ভেজো না। আমি সমুদ্রের এক বেগম। সমুদ্রের জলে আমায় তুমি ছেড়ে দিয়ে এসো। আমি কথা দিচ্ছি যদি তুমি কখনো বিপদে পড়, আমাকে ডাকলেই আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

আর দেরী না করে মহম্মদ গিয়ে মুলেটকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে এল।

এর দুদিন পরে সুলতান সেই মৌলভীকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটা মরেনি জেনে মৌলভীকে খুব গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে উজীরকে ডেকে আনালেন। বললেন, কী করি বল তো উজীর! ছেলেটা তো মরল না।

উজীর বলল, এবার একটা খাসা বুদ্ধি মাথায় এসেছে জাঁহাপনা। আপনি তো জানেন, সবুজ দেশের সুলতানের খুব সুন্দরী এক মেয়ে আছে। ওই দেশটা এখান থেকে সাত বছরের পথ। আমরা ওই জেলের ছেলেটাকে ডেকে বলব, সুলতানের তোমার উপরে খুব আস্থা রয়েছে। তাঁর ইচ্ছে, সবুজ দেশের সুলতানের মেয়েকে তিনি শাদী করেন। আর সেজন্য সেই মেয়েকে নিয়ে আসার দায়িত্ব তিনি তোমার ওপরেই দিতে চান। সুলতানের ধারণা, তুমি ছাড়া এ কাজের যোগ্য আর কেউ নেই।

—বাহ্‌ দারুণ বুদ্ধি বার করেছো—বললেন সুলতান, নাও—এখনই ওকে পাঠাও ওই দেশে।

সুলতান বলতেই এলেমদার মহম্মদকে ডেকে আনালেন উজীর। বললেন তাকে সুলতানের ইচ্ছের কথা।

সব শুনে মহম্মদ বলল, সবুজ দেশ! সেখানে আবার গেলাম কবে আমি! তাছাড়া চিনিওনা তো সে দেশের পথ!

উজীর বললেন, সে তো আমি জানি না। সুলতানের হুকুম হয়েছে। তাই তাঁর ইচ্ছে ও হুকুমের কথা তোমাকে আমি জানালাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে!

কি আর করবে মহম্মদ! রাগে গজরাতে গজরাতে বাড়ী ফিরে মা-বাবাকে সব খুলে বলল।

শুনে মা বলল, তুই কিছু ভাবিস না। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে যা, দেখবি সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

সমুদ্রের ধারে যেতেই সেই মুলেটের কথা মনে হল মহম্মদের। মহম্মদ তার নাম ধরে ডাকল। খানিক পরেই ঠিক কথামত ভেসে উঠল সেই মুলেট। বলল, বল মহম্মদ তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

মহম্মদ চারদিকে তাকিয়ে তখন সব ঘটনা এক নিশ্বাসে বলে ফেলল মুলেটকে। মুলেট শুনে বলল, এই ব্যাপার। তা এর জন্য এত ভাবছ কেন তুমি! এক কাজ কর সুলতানকে গিয়ে বল যে তুমি যেতে রাজি আছ। কিন্তু যাওয়ার জন্য একখানা খুব সুন্দর খাঁটিসোনার নৌকা চাই। আর নৌকাটা বানাবার জন্য যে খরচ হবে তা যোগাতে হবে উজীরকে।

মুলেটের কথামত মহম্মদ গিয়ে সুলতানকে তাই জানাল। সুলতান

তাতেই রাজি হল। কিন্তু খুশী হল না উজীর। তবুও কি করবে—রাগে কাঁপতে কাঁপতে নৌকা তৈরীর সব খরচই দিল সে।

নির্দিষ্ট দিনে নৌকা তৈরী হলে মহম্মদ তাতে চড়ে যাত্রা করল সবুজ দেশে। আর তাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তার বন্ধু সেই মুলেট। মুলেটের সাহায্যে খুব সহজেই একসময় মহম্মদ এসে উঠল সবুজ নদীর দেশে। মহম্মদ সেখানে পেঁছতেই একটা লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘোষণা করতে লাগল তোমরা ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ যে যেখানে আছ শোন। জেলের ছেলে এলেমদার মহম্মদ এসেছে খাঁটি সোনার তৈরী নৌকায় করে। এ নৌকা দেখতে চাও তো তোমরা নদীর ধারে এসো।

দেখতে দেখতে অমনি শুরু হল ভীড়। কত যে মেয়ে পুরুষ, কত যে ছোট-বড় নেড়ি-গেরি আর কচি-কাঁচার দল আসতে লাগল রোজ তার ইয়ত্তা নেই। আর যে-ই একবার দেখে সেই বলে চমৎকার! দারুণ! এমন নৌকা কেউ কখনো দেখেনি। পর পর আটদিন এমনি চলল ভিড়। শেষে একদিন সে দেশের

সুলতানের মেয়ে শাহজাদীর কানেও গেল কথাটা। যেতেই সেও ছটফট করে উঠল নৌকাটা দেখার জন্য। একদিন সুলতানকে বলেই ফেলল, বাজান, আমিও ওই নৌকাটা দেখতে যেতে চাই। সুলতান মেয়ের আবদার রাখতে অনুমতি দিলেন। আর সেই সঙ্গে একটা দিন ঠিক করে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিতে বললেন, সেদিন মেয়েপুরুষ, ছোটবড়, কেউই ঘরের বাহিরে যেতে পারবে না। শাহজাদী সোনার নৌকা দেখতে যাবে।

একদিন শাহজাদী নদীর ধারে এল। নৌকা দেখে আর তার আশ মেটে না। বার বার সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। শেষে এক সময় নৌকাটা দেখতে দেখতে মহম্মদকে দেখতে পেয়ে ইশারায় জানতে চাইল নৌকার ভেতরে এসে সে নৌকাটা দেখতে পারে কিনা! মহম্মদ ইশারায় 'পারে' জানাতেই শাহজাদী উঠে আসে নৌকায়। উঠে অতৃপ্ত নয়নে শুধু সেদিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে নৌকার কারুকার্য দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায়। মহম্মদ যখন দেখল শাহজাদী নৌকার রূপ দেখতে দেখতে তম্ময় হয়ে পড়েছে সেই সময়ে সে খুব আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে নৌকার কাছি আর নোঙরের খুঁটো তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল নদীর ভাটিতে।

কিছুক্ষণ পরে ডাঙায় নামার ইচ্ছে জাগায় শাহজাদী যখন চোখ খুলল, নৌকা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। দেখে চমকে উঠে শাহজাদী জিজ্ঞেস করল; ও এলেমদারের বেটা এ আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো?

—যাচ্ছি এক দেশের সুলতানের কাছে। তিনি তোমায় শাদী করবেন।

—সেই সুলতান কি খুব সুন্দর দেখতে ?
—তা আমি জানি না। গেলেই দেখতে পাবে।
এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদী নিজের আঙ্গুলের একটা আংটি খুলে জলে ফেলে দিল। দিয়ে বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। তুমি আমার বর। আমি কনে।

এদিকে হয়েছে কি আংটিটা শাহজাদীর হাত থেকে জলে পড়তে না পড়তেই সেটা মুখে ধরে ফেলল মুলেট। তারপর ওদের নৌকার আগে আগে মহম্মদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।
দেশে ফিরে মহম্মদ সুলতানের সঙ্গে দেখা করে বলল, সবুজ দেশের সুলতানের বেটিকে আপনার শাদীর জন্য নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা। কিন্তু শাহজাদী বলছে প্রাসাদ থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত সবুজ গালিচা পেতে দিতে। তার ওপর থেকে সে আসবে সুলতানের প্রাসাদে।
সবুজ দেশের শাহজাদীর কথা শুনেই উজীরের নিষেধ অমান্য করেও দেশের যেখানে যত সবুজ গালিচা ছিল, সব নিয়ে আসতে বললেন সুলতান। এনে প্রাসাদ থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত পাততে

বলা হল। গালিচা পাতা হলে তারপর শাহজাদী এল সেই গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে।
শাহজাদীকে দেখে সুলতানের আনন্দ আর ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালেন; আজ রাতেই শাহজাদীকে শাদী করবেন তিনি।
এতক্ষণ কোন কথা বলেননি শাহজাদী; সুলতানের কথায় এবার বলল, কিন্তু একটা কথা জাঁহাপনা। আপনি যদি আমাকে শাদী করতে চান; তাহলে আমার আংটিটা আপনাকে এনে দিতে হবে। আমাকে নিয়ে আসার সময় আঙ্গুল থেকে তা জলে পড়ে গেছে।
সুলতান উজীরের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে উজীর জানালেন, জাঁহাপনা, দোষটা তো ওই মহম্মদের। কজেই ওরই উচিত আংটিটা নিয়ে আসা।
সুলতান আবার তলব করল মহম্মদকে। সে এলে বললা তাকে আংটির কথাটা। এদিকে মুলেট দেশে পেঁছেই আংটিটা দিয়ে দিয়েছিল মহম্মদকে। তাই মহম্মদের পক্ষে সেটা বার করে দিতে আর এখন কোনো অসুবিধে হল না।
সুলতান আংটিটা নিয়ে শাহজাদীকে দিয়ে বললেন, তাহলে এবার শাদীর আয়োজন করা যাক।
শাহজাদী জানালেন; হ্যাঁ করা হোক। তবে সেটা হবে পুরোপুরি তাদের দেশের মতে। তাদের রীতি মেনে।
—কি সেই রীতি?
শাহজাদী জানাল; আমাদের নিয়ম হচ্ছে বরের বাড়ি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত একটা পরিখা খুঁড়ে সেই পরিখার ভেতরে ডালপালা আর শুকনো পাতা ভরে দিতে হবে। তারপর ধরাতে হবে আগুন। সেই আগুনের ভেতর দিয়ে পানি-প্রার্থী বরকে হেঁটে গিয়ে সমুদ্রে

চান করে তবে বিয়েতে বসতে হবে। এভাবে আগুনে শুদ্ধ ও সমুদ্রের জলে শুদ্ধ হয়ে তবেই সে কন্যাকে পাবে। তাছাড়া দেখতেও সে হবে আরও সুন্দর।

সুলতান শাহজাদীকে দেখা অবধি এতই মত্ত হয়ে উঠেছিল যে হিতাহিত কোনো জ্ঞান ছিল না। তাই শাহজাদীর কথা শোনা মাত্রই রাতারাতি পরিখা খোঁড়ার আদেশ দিয়ে উজীরকে বললেন;

শোন উজীর, কাল তুমিও আমার সঙ্গে পরিখার আগুনের ভেতর দিয়ে যাবে।

শুনে উজীরের মুখ কালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তা সামলে নিয়ে বললো, হ্যাঁ জাঁহাপনা, নিশ্চয়ই যাবো। তবে এক কাজ করুন না। ওই এলেমদারের বেটা মহম্মদকে বলুন আগে ও যেন ওই আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যায়। ও যদি না পোড়ে তাহলে আমাদেরও যেতে কোনো আপত্তি থাকবে না।

উজীরের পরমর্শটা খুব ভাল লাগল সুলতানের। মহম্মদকে ডেকে আনিয়ে সেই রকমই আদেশ দিলেন তিনি।

এদিকে মহম্মদকে আগেই বলে রেখেছিলেন মুলেট। যদি সুলতান তাকে আগুনের পরিখার মধ্য দিয়ে হেটে যেতে বলে, তবে যেন আল্লার নাম বলতে বলতে পরিখাটা পার হয় সে। তাহলে গায়ে আগুন দূরের কথা, আগুনের আঁচ পর্যন্ত লাগবে না।

পরের দিন তাই হল আল্লার নাম উচ্চারণ করতে করতে পরিখার ভেতর দিয়ে চলে গেল মহম্মদ। গায়ে তার একটুও আগুনের আঁচ লাগল না।

দেখে সুলতান তক্ষুণি উজীরকে বললেন, তাহলে চলো উজীর—সুযোগ বুঝে উজীর সুলতানকে বললেন, জাঁহাপনা, আপনার বেটাকেও এই সঙ্গে নিন না। তাহলে আপনার বেটাও খুব সুন্দর হয়ে উঠবে।

উজীরের বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের ছেলেকেও নিলেন সঙ্গে। তারপর চারজনে মিলে পরিখার আগুনের ভেতর নামলেন।

কিন্তু নামতে না নামতেই আগুন এসে গ্রাস করল ওদের। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারজনই তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য এরপর এলেমদার মহম্মদের সঙ্গেই সবুজ দেশের শাহজাদীর খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল। আর বিয়ের পরেই সে দেশের সিংহাসনে বসল মহম্মদ। তারপর জেলে-জেলেনীকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এসে বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগল তারা।

খলিফা হারুণ অল রসিদ ও পাঁচ ব্যক্তির পাঁচ কাহিনী

খলিফা হারুণ-অল-রসিদের স্বভাব ছিল নিজের রাজ্যের চারপাশে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখ-সুবিধে দেখা। তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা। এ জন্য তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেও উজীরকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতেন। সঙ্গে থাকত তার প্রিয় অনুচর মসরু।

সেদিনও এমনি বেরিয়েছেন। সঙ্গে সেই পরিচিত জাফর আর মসরু। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়েছিলেন, টাইগ্রীস নদীর ব্রীজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। খলিফার ততক্ষণে মনে পড়েছে, ব্রীজের এক পাশে বসে এক অন্ধ ভিখারি বসে ভিক্ষা করছে। সামনে তার ভিক্ষাপাত্র। খলিফা

এগিয়ে গিয়ে সেই ভিখারিকে একটা মোহর দিলেন। মোহর পেয়ে ভিখারির খুব আনন্দ। হারুণকে আশীর্বাদ করে বলল, আপনার এ দান আমি নিতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে?

—শর্ত! খলিফা তো ততক্ষণে অবাক। বলে কি, ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়ার পেছনে আবার শর্ত আছে! যাই হোক তবু বিনীত হয়েই তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলুন কি আপনার শর্ত?

—আমার মুখে একটা ঘুষি মারতে হবে, তবেই আপনার এ দান আমি নেবো—

খলিফা তাতে রাজী হলেন না। কিন্তু ভিখারিটাও তাকে ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত ভিখারি আর ছাড়ে না দেখে, তিনি আস্তে করে ওর গালে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিলেন। ভিখিরিও এবার খুশী হয়ে আবার খলিফাকে আশীর্বাদ করলেন। জাফরকে একপাশে ডেকে নিয়ে খলিফা এরপর বললেন, কাল ওকে আমার দরবারে এনো তো! ওর কাহিনী আমাকে শোনতে হবে?

বলে জাফর আর মসরুকে নিয়ে রওনা হলেন তিনি। খানিকটা গিয়ে আবার একজন ভিখারিকে দেখলেন তিনি। এই ভিখারিটা খোঁড়া। গালের ওপরে তার লম্বা কাটা দাগ।

খলিফা তার কাছে গিয়ে তাকেও একটা মোহর দিলে সে বলল, সেলাম জনাব—যখন মাদ্রাসার মৌলভী ছিলাম তখনও কেউ আমাকে একটা মোহরও দেয়নি।

শুনে এবারও জাফরকে বললেন খলিফা, [illegible] একেও আমার দরবারে এনো তো? এর কাহিনীও আমাকে শুনতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার এগিয়ে গেলেন হারুণ-অল-রসিদ। কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার দেখলেন এক

বুড়ো সওদাগর এক ভিখারিকে কোল ভরে মোহর দিচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন খলিফা। তিনি নিজেও কোনোদিন কোনো ভিখারিকে এত মোহর দেননি। অথচ এই সওদাগর অনায়াসে তা দিয়ে দিচ্ছে ভিখিরিটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে উজীর জাফরকে বললেন তিনি, কাল ওই সওদাগরকেও হাজির কর দরবারে। ওকেও আমার দরকার কাল।

একটু পরে আরও এগিয়ে একটা চিৎকারের শব্দে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন খলিফা। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল, একটা মিছিল যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে আর একজন ঘোড়সওয়ার সামনে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো—হিন্দুস্থানের সুলতানের জামাই আসছেন। এঁকে রাস্তা করে দাও।

বলতে না বলতেই সেই ঘোড়সওয়ারের পেছনে পেছনে আরও সুন্দর ঘোড়ায় করে অপরূপ এক সুন্দর যুবক রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

দেখে হারুণ বললেন, দেখ জাফর—ইনি আমাদের দেশের অতিথি। অথচ এর সঙ্গে এখনো আমার আলাপ হল না। যাও তুমি দেখে এস ইনি কোথায় থাকেন। তারপর কাল একেও আমার দরবারে আসতে বলো।

জাফর চলে গেলে মসরুরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন খলিফা হারুণ-অল-রসিদ। তখন সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। খলিফাও ফিরে যাবেন। এমন [illegible]াৎ তার চোখে পড়ল একটা সুন্দর মাদী ঘোড়ায় চড়ে আসছে অপরূপ সুন্দর এক যুবক। কিন্তু অবাক কাণ্ড! যুবকটির হাতে চাবুক। আর সেই চাবুক দিয়ে সপ্ সপ্ করে সে মারছে সেই ঘোড়াটিকে। ঘোড়াটার তেল চকচকে

গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবুও তার হুঁশ নেই। রাস্তার লোকজন সবাই দেখে শুধু 'আহা—আহা করতে লাগল, কিন্তু কেউ গেল না এগিয়ে। খলিফা গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করে জানলেন, এ ঘটনা রোজই ঘটে। রোজই এমন মার খায় ঘোড়াটা।

লোকটা চলে গেলে মসরুকে বললেন, যাও ওকে বলে এস কাল দুপুরে ও যেন আমার দরবারে যায়। না আসতে চাইলে জোর করে ধরে আনার ব্যবস্থা করবে।

পরদিন দুপুরে দরবার বসলে উজীর জাফর সেই পাঁচজনকে খলিফার সামনে হাজির করলেন। তারা সবে কুর্ণিশ করে খলিফার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা এবার সাদা মাদী ঘোড়ার মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ আমি অন্যায়ভাবে কাউকে কোনোদিন শাস্তি দিইনি। দেবেও না আশা করি। কিন্তু কাল তোমাকে দেখলাম একটা নিরীহ অসহায় ঘোড়ার পিঠে চেপে তাকে অনবরত চাপকাচ্ছো। তার দেহ থেকে রক্ত আর চোখ থেকে জল গড়াচ্ছিল। আমি জানতে চাই এর কারণ কি? যদি উপযুক্ত কারণ পাই কিছু বলব না। না পেলে খুব কঠিন শাস্তি পাবে তুমি? এখন বল কি সেই কারণ—

যুবক বিনীত হয়ে বলতে শুরু করল।

জাঁহাপনা, আমি একজন ধনী সওদাগরের ছেলে। বংশমর্যাদায় আমাদের পরিবারের খুব নাম ছিল। সেজন্য ছেলেবেলা থেকেই যার তার সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না আমাকে। এমননি কি মাদ্রাসায়ও পড়তে যেতে দেওয়া হত না আমাকে। মৌলভী এসে

বাড়িতে পাড়িয়ে যেত। সেজন্য আমার বন্ধুও ছিল না কেউ। তাই শুধু নয়—যখন বিয়ের বয়স হল, তখন আমাদের বংশমর্যাদা আর কৌলিন্যের পাশাপাশি সুন্দরী বড় বংশের একজন মেয়েও পাওয়া গেল না। তাই বিয়েও হল না আমার।

একদিন বাবা চোখ বুজলেন। বাবার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতে এল। কিন্তু এলেও আগের মতই সেরকমই কাটছিল আমার জীবন। তবে মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে? একদিন আমিও আমার মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। প্রায়ই মনে হতে লাগল, এভাবে নিঃসঙ্গ জীবন খুবই অসহ্য। বংশ-মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে ভাবলাম, এবার আমি বিয়ে করব। তাহলে অন্ততঃ একজন কথা বলার লোক পাব।

সেইভাবেই বেশকিছু দূরে বাঁদীর হাটে গেলাম একদিন। আপনি তো জানেন বাঁদীর হাটে দেশ বিদেশের নানা জায়গা থেকে সুন্দরী গুণবতী মেয়েদের বন্দিণী করে এনে চড়া দামে বিক্রী করা হয়। আমার তো টাকার অভাব ছিল না। নিজে গিয়ে দেখে শুনে পরমা সুন্দরী এক বাঁদী কিনে আনলাম। বয়স তার খুবই কম। কোন দেশ থেকে তাকে আনা হয়েছিল তাও জানি না। আমাদের দেশের ভাষা সে এক বর্ণও বুঝত না। তার ভাষাও আমার বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তবে মেয়েটি ভারী শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের।

আমি ভাবলাম বড়ই ছেলেমানুষ। দুদিন গেলে আমাদের ভাষা আর আচার আচরণ শিখে নেবে। তখন আমার ওপরও নিশ্চয়ই ওর মায়া পড়ে যাবে। তারপর ওকেই বিয়ে করব আমি। এখন আমাকে এড়িয়ে চলে চলুক।

এমনিই কাটছিল।

দিন দশেক বাদে রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম মেয়েটি তার নিজের ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। আমি উঠলাম। ভাবলাম—কি হয়েছে একবার দেখা দরকার। কিন্তু দেখতে গিয়েই দেখি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সদর দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়ল। বড় ভয় হল। ভাবলাম, যদি কোন বিপদে পড়ে। আমিও একটু আড়ালে থেকে ওর পেছনে পেছনে গেলাম।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে একটা কারখানায় ঢুকল। দেখলাম কোনো ভয় ডর নেই ওর। বেশ সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে একটা কবরের পাশে দাঁড়াল সে। অমনি সেই কবরের ভেতর থেকে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে, ওর একটা হাত ধরে ওকে পাথরের ওপর বসাল।

এসব ব্যাপার দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা! এ আমি কাকে ঘরে আনলাম! একবার ভাবলাম, চলে আসি। কিন্তু আবার মনে হল, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখেই যাই। তাই দাঁড়িয়েই রইলাম।

তারপর যা দেখলাম; তার তুলনায় এসব কিছুই নয়। নজরে পড়ল সেই ছায়ামূর্তিটা কবর হাতড়ে একটা মড়ার মাথা তুলে দিল

মেয়েটিকে। আর মেয়েটিও সেটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে আরম্ভ করল। দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। গোঁ গোঁ শব্দে প্রায় অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে গেলাম।

ওরা চমকে তাকিয়ে দেখল। তারপর মেয়েটা বিড়বিড় করে কি যেন বলল আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম আমি একটা কুকুর হয়ে গেছি। ওরা দুজনে তখন আমাকে মেরে ধরে গোরস্থান থেকে বার করে দিল।

এ অবস্থায় আমি আর বাড়িতে গেলাম না। প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে শহরের বাজারের ভেতরে গিয়ে উঠলাম। অমনি সেখান-

কার কুকুরগুলো আমাকে তেড়ে এল। আমি ছুটতে ছুটতে এক বুড়ো কষাইয়ের ঘরে আশ্রয় নিলাম। কষাই লোকটা ভালই ছিল। আমাকে সারারাত সেখানে থাকতে দিল। পরের দিন ভোরবেলা দোকানে সাফাই করার সময়ে আমাকে সেখান থেকে বের করে দিল।

ভয়ে ভয়ে আবার আমি রাস্তায় বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে এবার গিয়ে উঠলাম একটা রুটির দোকানের সামনে। রুটিওয়ালা নামাজ সেরে নাস্তা করছিল। আমাকে দেখেই একটুকরো রুটি ছুঁড়ে দিল। এত ক্ষিদে পেয়েছিল যে তাই খেয়ে নিলাম। তারপর ফেরার জন্য পা বাড়াতেই আবার এক দঙ্গল কুকুর এসে আমাকে ঘিরে ধরল। আমি ভয়ের চোটে দোকানের এক কোণে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়লাম। দোকানদার কিছু বলল না।

দুপুরে দোকান বন্ধ করে সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তার ছোট মেয়ে এসে আমাকে দেখেই মুখ ঢাকল। ওর বাবা তো অবাক। বলল, ও কিরে। একটা কুকুরকে দেখে মুখ ঢাকছিস কেন? ও কি বাইরের কোন পুরুষ মানুষ। বাবার কথায় মেয়েটি হঠাৎ—'দাঁড়াও আসছি—'বলে ভেতরে ঢুকল। খানিকক্ষণ পরে একটা পাত্রে কিছুটা মন্ত্র পড়া জল নিয়ে এসে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতেই আমি আবার আগের মত হয়ে গেলাম। রুটিওয়ালা ততক্ষণে চমকে উঠেছে। মেয়েটি বলল, বাবা, ইনি খুব বড় ঘরের ছেলে। কোনো এক ডাইনি একে এই অবস্থা করে দিয়েছিল।

একে একে আমি তখন সব ঘটনাটাই খুলে বললাম তাদের। শুনে মেয়েটি বলল; ওই মেয়েটি এখনও আপনার বাড়ি দখল করে বসে

আছে। আপনি এক কাজ করুন। এই মন্ত্রপূত জলের পাত্রটা সাবধানে নিয়ে যান। নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির গায়ে এইজল সামান্য ছিটিয়ে দিয়ে বলবেন; আল্লা; ওকে একটা মাদী ঘোড়া করে দাও। বাস্ দেখবেন—মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে গেছে; তখন আপনি রোজ ওর পিঠে চড়ে ওকে চাপকাবেন—যতক্ষণ না ওর গা থেকে রক্ত বেরোয়। যতখন না মুখ থেকে ফেনা বের হয়। এভাবে মারতে মারতেই একদিন ওর অনুতাপ আসবে। নাহলে আরও কত লোকের যে সর্বনাশ করবে তার ইয়ত্তা নেই।

মেয়েটির দেওয়া জল হাতে নিয়ে, তাদের অসংখ্যবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকে মেয়েটির ওই জল ছিটিয়ে দিয়ে আল্লার কাছে আর্জি জানালাম, ওকে একটা মাদী ঘোড়া বানিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হয়ে গেল সে। আর তারপর থেকে রোজই এভাবে ওকে মারছি।

গল্প শেষ করে যুবকটি তাকাল খলিফার দিকে। বলল; এবার বলুন জাঁহাপনা—আমি অন্যায় করেছি কিনা? যদি করে থাকি তাহলে আমার যা শাস্তি হয় তাই দিন। আমি মাথা পেতে নেব।

খলিফা শুনে বললেন; না বাবা—তোমার কোন অন্যায় হয়নি। তুমি ঠিক কাজই করেছো।

সাদা ঘোড়ার মালিকের কথা শুনে সবাই যেমন আশ্চর্য হল; তেমনি খুশিও হল সবাই।

হারুণ-অল-রসিদ এবার হিন্দুস্থানের সুলতানের জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলুন রাজকুমার—আপনার কথা বলুন। আমি জানতে চাই কেমন লাগছে আপনার এই শহর বাগদাদকে। আপনি কি কোনো কাজে এসেছেন এখানে? নাকি এমনি বেড়াবার জন্যই—

হিন্দুস্তানেয় সুলতানের জামাই এবার বলতে লাগল।

জাঁহাপনা হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাই হলেও আমি কিন্তু এই বাগদাদ শহরের এক গরীব কাঠুরের ছেলে। বাবা জীবিত অবস্থাতেই তার জঙ্গলে গিয়ে এই কাজটা আমিও শিখে নিয়েছিলাম। ফলে ভবিষ্যতেও যে এটাই আমার পেশা হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মা-বাবার মৃত্যুর পর দেখলাম, এই কাজ করে যা পারিশ্রমিক পেতে লাগলাম তাতে আমার তার আমার স্ত্রীর খাওয়া পড়া ভাল মত হয় না। তারপরও আমার স্ত্রীর চেহারা এমন কদাকার ও মেজাজটা এত উগ্র ছিল যে জীবনে আমার শান্তি ছিল না। জানি না কি দেখে ওই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন আমার

বাবা। শুধু তাই নয়, কাঠ বিক্রি করে যা পয়সা ঘরে আনতাম, আমার বউ সে সব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিত। কিছু বললে আমাকে মারতে আসত।

একটা বড় গাছ কাটার জন্য মোটা দড়ি কেনার দরকার হয়ে পড়লে স্ত্রীকে এসে বললাম। স্ত্রী তো আমার কথা শুনেই আগুন। বলল ওই মোটা দড়ির নাম করে আমি নাকি পয়সা মারার তাল করছি। সরু দড়ি হলেই চলবে। তাই শুধু নয়। সরু দড়ি নিয়ে সে আমার সঙ্গে জঙ্গলে যাবে। দেখিয়ে দেবে সরু দড়ি দিয়ে কাজ চলে কিনা!

বাড়িতে সারাদিন অশান্তি লেগেই থাকে। কিন্তু জঙ্গলে গাছ কাটার ফাঁকে ফাঁকে ওই সময়টুকুই ছিল আমার শান্তির সময়। তাও যদি নষ্ট হয় তাহলে তো আমি বেঁচে থাকব না। ভাবতে ভাবতে মনটা বিষিয়ে উঠল। তবু উপায় কি! মুখ থেকে কথাটা যখন বের করেছে একবার, তখনতো নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু যেতে যেতে বনের মধ্যে একটা শুকনো কুয়ো দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এল আমার। আমি বউকে বললাম, আসলে তোমাকে আমি একটা মিথ্যে কথা বলেছি। এই কুয়োর ভেতরে অনেক সোনাদানা আছে। সেগুলো তুলে আনার জন্য একটা মোটা দড়ি চেয়েছিলাম—কোমরে বেঁধে নিজেই নামব বলে।

বউ শুনে তো ক্ষেপে লাল। বলল, তোমরা পুরুষরা ভীষণ পাজি। এতক্ষণে বুঝলাম, মোটা দড়ির কারণটা। ঠিক আছে যে সরু দড়ি এনেছি তাতেই হবে। তবে তুমি নও। আমি নামব ভেতরে। তুমি আমার কোমরে দড়িটা বাঁধো।

এটাই ঠিক চাইছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, একটু ভয় দেখিয়ে

দজ্জাল বউটাকে একটু শিক্ষা দিই। তাই বউ যখন বলল তার কোমরে দড়ি বেঁধে তাকেই নামিয়ে দিতে; আমি তাতে সানন্দেই রাজি হলাম। আর দেরী না করে বউয়ের কোমরে দড়ি বেঁধে কুয়োর ভেতরে তাকে নামিয়ে দিয়ে পুরো দড়িটা ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, নাও এবার তোমার বদমেজাজের জন্য শাস্তি ভোগ কর। বলে হন হন করে বনের দিকে চলে গেলাম। বিকেলের দিকে কিনে আনলাম মস্ত বড় মোটা দড়ি।

দুটোদিন এভাবে শান্তিতেই কাটল। তিন দিনের দিন মনটা একটু নরম হল আমার। ভাবলাম; যাক দুদিন ধরে খুব কষ্টই পেয়েছে। এবার ওকে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে সেই মোটা দড়িগাছা নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। কুয়োর কাছে গিয়ে দড়িটার একটাদিক ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম; নাও নিশ্চয়ই অনেক শিক্ষা হয়েছে। এবার এই দড়ির একটা দিক ধরো। আমি টেনে তোমাকে ওপরে তুলে আনছি।

টানতে গিয়েই অনুভব করলাম; খুব ভারী কি যেন একটা উঠে আসছে। কেমন যেন সন্দেহ হল। খুব কষ্ট করে শরীরের মেহনত লাগিয়ে তুলে আনতেই ভয়ে চমকে উঠলাম—একটা বিশালকায় দৈত্য। আমি ভয় পেয়েছি দেখে দৈত্য বলল; না না —ভয় পেয়ো না। ভয়ের কিছু নেই। আসলে আমি আর থাকতে না পেরে উঠে এসেছি।

—তার মানে আমার স্ত্রী কোথায় ?

দৈত্য বলল; দেখ কাণ্ড ! ওই দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েটা তোমার বউ নাকি ! উফ্ কি ঝগড়াটে, কি মারকুটে বাপের বাবা। মেরে মেরে ওই দুদিনে আমার গায়ের ছাল চামড়া তুলে দিয়েছে।

তারপর হয়েছে কি—সত্যি বলছি—আজ সকালে উঠেই ওর ঠ্যাং দুটো ধরে সামান্য একটু ঘোরাতেই—ওই কি বলে না—একদম অক্কা পেয়ে গেছে।

সামাণ্য একটু চুপ করে দৈত্য আবার বলল, ঠিক আছে সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি তোমার সঙ্গে হিন্দুস্থানের পরমাসুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেব। যা বলি শোনো এখন—। হিন্দুস্থানে সুলতানের মেয়ের শরীরে গিয়ে আমি ভর করছি এক্ষুণি। ফলে সুলতান হাকিম ডাকবেন। বৈদ্য ডাকবেন। বলবেন; যে তার মেয়েকে ভাল করে দিতে পারবেন তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও তার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন তিনি। কিন্তু কেউই পারবে না মেয়েকে ভাল করতে। এই সময়ে তুমি যাবে। গিয়ে সামাণ্য একটু জল ছিটিয়ে তার গায়ে দিলেই আমি বেরিয়ে যাবো। তখনি তোমার কাছে সম্পর্ক পাতাবেন সুলতান। নাও তুমি তৈরী হও। তোমার তো সেখানে যেতে মাস দুই সময় লাগবে। আমি এক্ষুণি পেঁছে যাবো। ভয় নেই রাস্তায় কোন বিপদ হবে না তোমার। যাও রওনা হও—

বলতে না বলতে শাঁ করে উড়ে গেল দৈত্য।

দৈত্যের কথামত মাস দুয়েক পরে অমি পেঁছলাম সেখানে। সুলতানের প্রাসাদে ঢুকলাম। জল ছিটিয়ে দিয়ে মেয়েকে সুস্থ করলাম।

মেয়ে সুস্থ হতেই পূর্ব ঘোষণা মত আমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিলেন সুলতান। সেই সঙ্গে তার মেয়েকেও তুলে দিলেন আমার হাতে। তখন থেকেই আমার অবস্থা ফিরেছে জাঁহাপনা। কিন্তু ফিরলেও মাঝে মাঝে মাঝেই বাগদাদের জন্য মন খারাপ করে আমার। সেজন্য এখানে আসি মাঝে মাঝে।

হিন্দুস্হানের সুলতানের জামাইয়ের কাহিনী শুনে খলিফা খুশি হলেন। তাকে নিজের পাশে বসিয়ে এরপর সেই বুড়ো সওদাগর যে এক ভিখারিকে কোল ভরে মোহর দিয়েছিল তার কথা শুনতে চাইলেন।
বুড়ো সওদাগর বলতে শুরু করল।

জাঁহাপনা আমি দড়ির ব্যবসা করি। আমার বাপ-ঠাকুরদাও তাই করত। সংসারে আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া এখন কেউ নেই। কাজেই ব্যবসার আয় থেকেই আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তবে বাড়তি যা আয় হয় তা আমি রোজই গরীব দুঃখীকে দিয়ে দেই। আমার দোকানটি শহরের খুব সুন্দর জায়গায়। সামনে একটা চওড়া বারান্দা আছে। তাতে ফুরফুরে হাওয়া আসে। খানিকটা জিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাই শহরের অনেক গনামাণ্য লোকই আমার বারান্দায় এসে বসেন প্রায়ই। বসে হাওয়া খেতে খেতে কথা বলেন।
একদিন সাদ ও সাদী নামে শহরের দুই বিশিষ্ট লোক এসে আমার বারান্দায় বসলেন। বসে নানারকম আলোচনা করতে লাগলেন। এক সময় আমার কানে এল সাদীর কথা।
সাদী বলছেন, দেখ ভাই সংসারে দুজাতের মানুষ হয়—ধনী

আর গরীব। ধনীরা বুদ্ধিমান। তারা টাকা জমাতে জানে। টাকা রাখতেও পারে। আর দেখ—গরীবরা বোকা। তাই ওরা যা রোজগার করে, তাও রাখতে জানে না।
সাদ বললেন, টাকা দরকারী বস্তু ঠিকই; কিন্তু ধনীরা বড় লোভী হয়। একটা পয়সা কাউকে দিতে চায় না। অথচ আমাদের এই বন্ধু, দাড়ির দোকানের মালিক হাসানকে দেখ—যা রোজগার করে তার বেশিটাই দান করে। এরকম মানুষের টাকা কখনো ফুরোয় না। আসল কথাটা কি জান আল্লা দয়া করলে টাকা ফুরোয় না; দয়া না করলে হাজার চেষ্টাতেই টাকা জমে না।
এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন জাঁহাপনা। এক সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরছি হঠাৎ ঠক্ করে কি যেন আমার পায়ে লাগল। হাতে তুলতেই দেখি—সীসের তৈরী একটা মাছ ধরার জালের কাঠি। ভাবলাম ঘরে নিয়ে রেখে দিই। যদি কোনোদিন কাজে লাগে। ভাবতেই সেটা নিয়ে এসে ঘরের এক কোনায় কুলঙ্গির ভেতরে রেখে দিলাম।
সেই রাত্রেই হঠাৎ ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে বেরিয়ে দেখি আমারই প্রতিবেশী এক জেলে। আমাকে বেরোতে দেখেই বলল, মালিক, আপনার ঘরে কি একটু লোহা বা সীসের টুকরো পাওয়া যাবে। আমার জালের একটা কাঠিও নেই। যদি খুঁজে পেতে দেখেন তবে খুব উপকার হয়। আজকের ধরা সেরা মাছটাই আমি আপনাকে কাল সকালে দিয়ে যাবো—।
—আরে না-না তা দিতে হবে না। আমি একটা জালের কাঠিই কুড়িয়ে পেয়েছি আজ বিকেলে। কখনো কারো কাজে লাগবে ভেবে রেখে দিয়েছিলাম। এখন দেখো বোধহয় তোমারই কাজে

লাগল।
ঘরে ঢুকে কুলুঙ্গি থেকে সীসের কাঠিটা এনে জেলের হাতে তুলে দিলাম। জেলে খুশি হয়েই চলে গেল।
কিন্তু পরের দিন সকালেই সে আবার এসে হাজির। সঙ্গে একটা বড় মাছ। মাছটা আমাকে দিয়ে বলল, ভেজে খাবেন মালিক। কাল অনেক মাছ পড়েছে আমার জালে।
মাছটা নিয়ে এসে স্ত্রীর হাতে দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে ওটা কাটতে বসে গেল। একটু পরেই যখন পেটের মাঝখান দিয়ে দু টুকরো করে ফেলেছে, সেই সময়ে ঠং করে চমৎকার রঙিন একটা নুড়ি বেরিয়ে পড়ল তার পেট থেকে।
নুড়িটা মাটিতে পড়তেই আমি হাতে তুলে নিলাম। অনেক সময় সমুদ্রের বা নদীর বড় বড় মাছেরা এমনি সব পাথর গিলে খেয়ে নেয়। সেরকমই কোনো পাথর ভেবে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী মনে হওয়ায় একটু পরেই সেটা ধুয়ে এনে আমার টেবিলের ওপরে রেখে দিলাম।
সন্ধে বেলায় বাড়ি ফিরতেই আমার স্ত্রী আমাকে বলল, শিগগির দেখবে এসো—পাথরটা থেকে কেমন অদ্ভুত আলো বেরোচ্ছে।
তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। পাথরটাকে হাতে তুলে এবার আবার ভাল করে দেখে নিলাম। আমার কেমন সন্দেহ হল।
দেখতে দেখতে এই আলোর কথা ছড়িয়ে পড়ল পাড়া প্রতিবেশী-দের মধ্যে। একদিন এক প্রতিবেশী জহুরীর বউ এসে আমার স্ত্রীকে ধরল। নিজের ছেলের অসুখের মিথ্যে খবর দিয়ে বলল, হাকিম বলেছে ঠিক এরকমই একটা পাথর ছেলের গলায় পরাতে।

আমি দশ দিনার দিচ্ছি। এটা আমাকে দিয়ে দিন।
স্ত্রীর কাছে শুনে আমি বললাম, না-না এটা আমি বেচবো না। খুব সুন্দর জিনিস। এটা আমাদের ঘরেই থাকবে।

একটু পরে সেই মহিলা আবার এল। আমার স্ত্রীকে বলল, আচ্ছা না হয় একশো দিনারই দিচ্ছি। ওটা আমাকে দিয়ে দিন।

আমি এবারেও নাছোড়বান্দা। বললাম, না-না, দেবো না আমি। মহিলা আবারও অনুরোধ করল। এবারে জানালাম; ঠিক আছে দিতে পারি কিন্তু এক লাখ দিনারের কমে নয়।

—এক লাখ! মহিলা শুনে অবাক হয়ে বলল; ঠিক আছে তাহলে আমার স্বামীকেই বলছি আপনার কাছে আসতে। কেননা আমি তো এসব ভাল বুঝি না।

খানিক পরে তার স্বামী সেই জহুরী এল। লোকটার বয়স হয়েছে। কিন্তু ভারী ধূর্ত। সে এসেই পাথরটা দেখে বলল, জনাব; এ তো ঝুটো কাচ ছাড়া কিছু নয়। এর আর কত দাম হবে। আপনি ওই একশ দিনারেই দিয়ে দিন আমাকে।

আমি কোনো কথা বললাম না। লোকটির দিকে একটু তাকিয়ে তারপর ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিলাম। সব বন্ধ করতেই পাথরটা থেকে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। লোকটার চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'উরে বাব্বা! কত বড় বৈদূর্যমণি!' শুনেই আমি বুড়োকে বললাম, তাহলেই বুঝুন। ঝুটো কাচ বলে তো প্রথমেই মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

লোকটি এবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলল; একটু যদি বিবেচনা করতেন!

বিবেচনা করার আর কিছু নেই। তাহলে তো দশ লাখ দিনার চাইতাম।

লোকটি আর কি করে! এক লাখেই রাজি হয়ে গেল। বুঝলাম, বাইরে গাধার পিঠে মোহরের বস্তা চাপিয়েই চলে এসেছে। আমার কথায় রাজি হওয়ার পর সেই বস্তা গুলোকে ঘরের মধ্যে উপুর করে ঢেলে দিয়ে গেল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল মোহরে। এ ভাবেই আমার ভাগ্য ফিরে গেল। তাহলেই বুঝুন জাঁহাপনা —আল্লা না দিলে কি এই টাকা পাওয়া যেত। এ দুনিয়ায় সব কিছুই ঘটে আল্লার দয়ায়।

খলিফা কথাটা মানলেন। তারপরেই বললেন, আর আশ্চর্য কি জান! ওই জহুরী বুড়ো তোমার কাছ থেকে এক লাখ দিনারে পাথরটা কিনে আমার কাছে তা দশ লাখ দিনারে বিক্রী করেছে।

—তা করুক। আমি বললাম, ওই ঘটনার পর থেকেই আমি যা রোজগার করি, তার সামান্য রেখে দিয়ে বাকি সবটাই দিয়ে দিই ভিখিরিদের।

বুড়ো সওদাগরের কাহিনী শুনে খলিফা থেকে দরবারের সবাই তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল।

হারুণ-অল-রসিদ এবার মাদ্রাসার খোঁড়া মৌলভিকে বললেন, এবার তোমার কাহিনী বল আমি শুনি।

মৌলভি বলতে শুরু করল।

জাঁহাপনা আমি এক মাদ্রাসার মৌলভি ছিলাম। আমার চব্বিশজন ছাত্র ছিল। কিন্তু সেই ছাত্রদিগকে আমি ভীষণ কড়াভাবে শাসন করতাম। এক মুহূর্তের জন্যও বেরোতে দিতাম না। মাঝে মাঝেই বেতিয়ে লাল করতাম।

একদিন আমার এক ছাত্র আমাকে হঠাত বলল, মৌলভি সাহেব আপনার মুখ কেন হলদে?

আমি তাকে ধমকে বসিয়ে দিলাম। খানিক্ষণ পরে আমার সহকারী আর এক মৌলভিও এক প্রশ্ন করল আমাকে। বলল, সাহেব আপনি বাড়ি চলে যান। আমি এদিকটা দেখছি। আপনি বোধহয় খুবই অসুস্থ।

সহকারীর কথায় আমার টনক নড়ল। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে বউকে ডেকে বললাম, দেখ আমার বোধহয় ন্যবা হয়েছে। শিগ-গিরই এক গ্লাস সরবৎ করে দাও তো আমাকে।

বউ চলে গেল সহকারী আবার এল। এবার তার হাতে চব্বিশটি পয়সা। জানাল, আমার ছাত্ররা চাঁদা তুলে আমাকে ফল খাবার জন্য পাঠিয়েছে।

ভীষণ অবাক হলাম। মনে মনে দুঃখ হল। রোজ যাদের এত বেতের বারি লাগাই; উঠতে-বসতে যাদের গালাগাল করি—সেই আমার ছাত্ররাই কিনা আমার অসুখে চাঁদা তুলে পয়সা পাঠিয়েছে। ওদের জন্য তখুনি আমার মনটা ভারী হয়ে ওঠে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামল। সহকারীকে বললাম; কাল একবার খেলতে যাওয়ার জন্য ছুটি দিও।

পরের দিন সহকারীটি আবার এল। এসেই বলল; এ কি সাহেব আপনাকে যে আরো খারাপ দেখাচ্ছে। মুখটা যে আরও হলদে হয়ে যাচ্ছে।
সহকারীর কথায় বুঝলাম; সত্যিই রোগটা খুব খারাপ দিকে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে শরীরটাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। তাছাড়া উঠতে বসতে খুব দুর্বল মনে হয়। তাকে বললাম; সে যেন এ সপ্তাহটা মাদ্রাসার কাজ চালিয়ে নেয়।
কথা শুনে সে চলে গেল। আবার এল এক সপ্তাহ বাদে। হাতে আবার চব্বিশটি পয়সা। জানাল; ছাত্ররা আবার চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে। একটু থেকে আমাকে সাবধানে থাকতে বলে সে চলে গেল। চলে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। কতদিন বাইরে বেরোই না। মাদ্রাসায় যাই না। শরীরে যে কী উৎপাত শুরু হল। খেতে ইচ্ছে করে না। বসে থাকতে পারি না। সব সময় খালি শুয়ে থাকতে ভাল লাগে।
দিন কয়েক বাদে আমার অবস্থা শুনে ছাত্ররা এল দেখা করতে। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে তারা জিজ্ঞেস করল, শুনলাম

আপনার অবস্থা ভাল নয়। আপনি নাকি চোয়াল নাড়তে পারছেন না।

শুনে আমার মেজাজটাই খাপ্পা হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, দাঁড়াও পারি কি না দেখাচ্ছি। তোমরা আমাকে ভেবেছোটা কি? আমি অসুস্থ থাকলে তোমাদের খুব মজা তাই না?

ঠিক সে সময়ে আমার স্ত্রী আমার জন্য সকালের জল-খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। দুটো সেদ্ধ গরম ডিম ও কয়েকটা রুটি। খোসা ছাড়ানো ডিমদুটো দেখেই ভাবলাম, এবার এদের দেখিয়ে দিই আমার চোয়াল নড়ে কি না?

ভাবতেই গরম ডিমদুটো একবারে মুখে পুরে দিলাম। কিন্তু তাতে কামড় বসিয়েছি কি বসাইনি হঠাৎ ডিমদুটো ভেঙে গিয়ে আমার জিভ আর টাগরার সঙ্গে আটকে গেল। একে আগুনের মত গরম, তার ওপরে মুখের ভেতরে আটকে যাওয়ায় গোটা মুখটাই পুড়ে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ওষুধবিষুধ লাগালাম। লাগালে হবে কি—সেই পোড়া ঘা এখনো আমার সারেনি। তবু সেই অবস্থায়ই এরপর আবার মাদ্রাসায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তাদের পাড়িয়েছি। কিন্তু আগের মত আর পারিনি। তার ওপর ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে একদিন কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটল! অনেক নিচে জল থাকায় ছাত্রদের বলেছিলাম আমাকে দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়ে দিতে। আমি তাদের জন্য টুপি করে জল তুলে দেব।

ছাত্ররা তাই করল। দড়ি বেঁধে আমাকে কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দিল আস্তে আস্তে নামছি। আর খানিকটা নামলেই হাতের নাগালে জল পেয়ে যাবো, কিন্তু সেই সময়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল। একটা

খ্যাপা গাধা দেখে ছেলেরা দাঁড় ছেড়ে পালিয়ে গেল। আর আমিও ধপাস করে কুয়োর ভেতরে পা ভেঙে পড়ে গেলাম। সেই থেকে আমি এমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি। এই আমার কাহিনী জাহাঁপনা।

মৌলভীর কথা শুনে খলিফার এত দুঃখ হল যে তার ওষুধ পত্র আর মাসোয়ারার ব্যবস্থা করে দিয়ে, সেই অন্ধ-ভিখিরিকে বললেন নাও এবার তুমি বল—ঘুঁষি না মারলে কেন তুমি ভিক্ষে নাও না?

অন্ধ ভিখিরি বলতে শুরু করল।

জাহাঁপনা আমি চিরকাল এমনি ভিখিরি ছিলাম না। আমার ছিল উটের ব্যবসা। উট ভাড়া খাটিয়ে আমি টাকা রোজগার করতাম। এমনি করতে করতে একদিন দেখি আমি আশীটা উটের মালিক হয়ে গেছি।

একবার আমার আশীটা উটের পিঠে করে এক ব্যবসায়ীর মাল বাগদাদ থেকে বাসরাহে পেঁছে দিয়ে ফিরে আসছি।

গ্রীষ্মের দুপুর। মাথার ওপরে দাউ দাউ করে জ্বলছিল রোদ। তাছাড়া বেশ খিদেও পেয়েছিল। একটা মাঠের মাঝখানে বিরাট একটা গাছ দেখে তলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে, সবে খাওয়ার আয়োজন করছি এমন সময় এক বুড়ো ফকির এলেন। মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। ঠোঁটে হাসি। আর মুখখানা বড় উদাস ধরণের।

একসময় রোদ পড়ে এলে আমরা উঠে পড়লাম। আমি যাব বাগদাদে। তিনি বাসরাহে বিদায় নেওয়ার আগে মিষ্টি কথায় তিনি বললেন; বেটা তুমি দেশের পর দেশ ঘুরছো অর্থের ধান্দায়। আর আমি! আমি ঘুরছি পরমার্থের ধান্দায়। তা তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি কিছু দিতে চাই তোমাকে। কত টাকা পেলে তুমি খুশি হও। আর এভাবে ঘুরতে হয় না তোমাকে!

আমি মনে মনে খুশি হয়ে বললাম; এই ধরুন না লাখখানেক সোনার মোহর পেলেই আমার চলে যাবে।

—তাহলে উটগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমি গোপন এক জায়গা থেকে অনেক ধনরত্ন তোমাকে দেব।

গেলাম তার সঙ্গে সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে এক পাহাড়ের সামনে পেঁছতেই দেখি একটা সরু পথ। ফকির বললেন; এবার উটগুলোকে এখানে এই গাছের ছায়ায় রেখে চল আমরা ভেতরে যাই। কেননা উঠ নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। তুমি বস্তা নাও সঙ্গে।

আমি একটা বস্তা নিচ্ছিলাম। ফকির জানালেন; একটা নয় আশীটা বস্তাই নিয়ে চল। যা আনবে তার অর্দ্ধেক আমার।

বাকি অর্ধেক তোমার।
আশীটা বস্তা নিয়েই এবার ফকিরের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। সেই সরু পথের যেখানে শেষ সেখানে একটা উপত্যকা। এরপরে একটা খাড়াই পাহাড়। ফকির তার ঝোলা থেকে এক ধরণের ধূপ নিয়ে তার ধুপদানিতে দিয়ে পোড়াতেই চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরে ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি পাহাড়ের তলায় একটা গুহার মুখ।
সেই গুহার মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। আগে আগে ফকির পেছনে পেছনে আমি। একটু যেতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। চারপাশে তাকিয়ে দেখি রাশি রাশি মোহর আর মণি-মাণিক্য। তাড়াতাড়ি বস্তা ভর্তি করে মোহরগুলো তুলতে যাচ্ছি এমন সময় ফকির বললেন, না—না মোহর টোহর নেওয়ার দরকার নেই। ওগুলোর ওজনও বেশি, তাছাড়া দামও কম ওগুলোর। তার চেয়ে যত পারো মণি-মাণিক্য ভরে নাও বস্তাগুলোতে।
তাই করলাম। তারপর বস্তাগুলোকে একটা একটা করে নিজের পিঠে বয়ে এনে উটের পিঠে পরপর বসিয়ে দিলাম। এভাবে আশীটা বস্তা ভর্তি করে আশীটা উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে সেখান থেকেই বেরিয়ে এলাম আমি। তবে অবাক হয়ে গেলাম ফকিরকে কিছু না নিতে দেখে। তিনি শুধু একটা সোনার জালা থেকে ছোট্ট একটা সোনার কৌটো বের করে নিজের বুকে গুঁজে রাখলেন।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে ওতে ?
তেমন কিছুই না—ফকির বললেন, সামান্য একটু মলম আছে।
মলমের কথা শুনে আমি আর কিছুই বললাম না। হাঁটতে

হাঁটতে উটগুলোকে নিয়ে আবার সেই গাছ তলায় ফিরে এলাম; যেখানে ফকিরের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল। সেখানে পেঁছেই ফকির বললেন, এবার তো আমাকে চলে যেতে হবে। তা যাওয়ার আগে কথামত আমাকে অর্ধেক ভাগ ধনরত্ন দিয়ে দাও।

অত ধনদৌলত পেয়ে আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ফকিরের কথা শুনে আমি বললাম তাকে; আপনি ফকির সংসার-ত্যাগী। অত ধন দৌলত দিয়ে কি করবেন? আমি সংসারী। আমার টাকার দরকার।

ফকির হাসলেন। বললেন; তুমি তো নিজের জন্য চাও তা পেয়েছোও অনেক। কিন্তু আমার নিজের জন্য দরকার নেই; দরকার গরীব দুঃখীদের জন্য। তাদের আমি বিলিয়ে দেব। যাই হোক; এখন যা ভাল বোঝ তাই কর তুমি।

আমি তখন ষাট বস্তা আমার জন্য রেখে বাকি কুড়ি বস্তা তাঁকে দিয়ে দিলাম। বললাম, নিন এই কুড়ি বস্তা দিচ্ছি। গরীবদের দেওয়ার জন্য এই ঢের।

তিনি তাতেই সন্তোষ্ট হলেন। তবে কুড়িটা উট চেয়ে নিলেন বস্তাগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার কষ্ট হলেও অনিচ্ছাসত্বে তাকে দিয়ে দিলাম কুড়িটা উট। কিন্তু ফকির বস্তা ভর্তি কুড়িটা উট নিয়ে একটু এগোতেই বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল আমার। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ফকিরকে বললাম, কুড়িটাই নেবেন। তার চেয়ে আরও দশটা আমাকে দিয়ে দিন।

ফকির হাসি মুখে তা দিয়ে দিল। কিন্তু লোভ বড় সাংঘাতিক জাহাপনা। একবার ভেতরে ঢুকলে কুরে কুরে খায়। আমারও

তাই হল। একটু এগিয়ে দশটা উটকে রেখে আবার ফকিরের পেছনে ছুটলাম। গিয়ে বললাম; ওই দশটা উটও আমাকে দিয়ে দিন।
ফকির এবারও হাসি মুখে দিয়ে দিল।
তারপর দশটা উটকে রেখে আবারও ছুটলাম। এবার গিয়ে বললাম, আপনার হাতের ওই সোনার থালাটি দিন।
ফকির সেটিও আমার হাতে তুলে দিলেন।
আমি এরপর বললাম, তাহলে আর ওই মলমের কৌটোটাই বা আপনার কাছে রাখবেন কেন? ওটাও আমাকে দিয়ে দিন।
ফকির এবারও হাসি মুখে আমাকে দিয়ে দিল সেটা।
আমি তখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম। ফকির কৌটোটা দিতেই বললাম, তাহলে এই মলম দিয়ে কি হয় বলে দিন? কি অসুখ এতে সারে?
ফকির বললেন; কোনো রোগের ওষুধ নয় এটা। এই জিনসটা হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির মলম। বাঁ চোখে লাগাতে হয়। তাহলে দুনিয়ার সব গুপ্তধনের লুকোনো জায়গা দেখতে পাওয়া যায়।
—আর ডান চোখে লাগালে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
ফকির বললেন, ডান চোখে লাগিও না। তাহলে চিরদিনের মতই দুটো চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।
আমি বললাম; তাহলে একটু পরীক্ষা করা যাক। আপনি আমার বাঁ চোখে লাগিয়ে দিন।
তিনি তাই দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যেখানে যত গুপ্তধন আছে, তা ছবির মত ভেসে উঠল। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ফকিরকে বললাম, তাহলে এবার ডান চোখে লাগিয়ে দিন।

—না—না কি বলছো তুমি ?

—ঠিকই বলছি। এক চোখে যখন এত ধনদৌলত দেখছি; অন্য চোখে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু দেখব। আপনি ব্যাপারটা গোপন করে গেছেন। তাই বললেন অন্ধ হয়ে যাবো। নিন এবার ডান চোখে লাগিয়ে দিন দেখি।

ফকির রাজি হল না। আমি ভয়ংকর রেগে উঠলাম। আমার সেই রাগ দেখে এবার খানিকটা গম্ভীর হয়ে মলমটা আমার ডান চোখে লাগিয়ে দিলেন ফকির। মুহূর্তেই আমার দুচোখে অন্ধকার নেমে এল। আমি অন্ধ হলাম। আর সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলাম, উটগুলো নিয়ে ফকির সেখান থেকে চলে যাচ্ছে। আমি রাস্তার পাশেই পড়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বাগদাদের এক সওদাগর। আমাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে তিনিই আমাকে তুলে নিয়ে এলেন বাগদাদে। সেই থেকে আমি ভিক্ষে করে খাই জাহাঁপনা। আর নিজের পাপের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, যারা আমাকে ভিক্ষে দেয় তাদের বলি একটা করে আমার মুখে ঘুঁসি মারতে। অন্ধ লোকটির কথা শুনে খলিফার ভীষণ দুঃখ হল। তিনি তাকে মাসোহারার একটা ব্যবস্থা করে, যে পাঁচ ব্যক্তি তার দরবারে এসে তাদের কাহিনীগুলো শুনিয়েচে, তাদের প্রত্যেককে নানান উপহার ও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে সেদিনের মত দরবার শেষ করে উঠলেন।

কানা ফকিরের গল্প

বাগদাদ শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে এক ফকির। খুব সুদর্শন চেহারা। যেমন তার রূপ তেমনি তার গায়ের রঙ। কিন্তু হলে হবে কি যুবকটির সব রূপ ঢাকা পড়ে গেছে তার বাঁদিকের ওই একটা চোখে। চোখটা তার কাণা। সে কাণা চোখ দিয়ে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না সে। তা না পাক। একটা গেছে আর একটা তো আছে। সেটা দিয়েই আজব শহর বাগদাদের নানা জিনিস দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল সে।

সে যাচ্ছিল আসলে বাদশা হারুণ-অল-রসিদের কাছে। শুনেছি, হারুণ-অল-রসিদের দয়ার শরীর। তাঁর কাছে নিজের দুঃখের

কথা বললে যেন দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব হয়। তাছাড়া দুঃখ-কষ্টও দূর হয়ে যায়। সে তাই চলেছে হারুণ-অল-রসিদের দরবারে। নিজের দুঃখকষ্ট জানাতে।

কিন্তু ফকিরের আবার দুঃখ কি! সংসারত্যাগী মানুষের আবার জ্বালাযন্ত্রণা কোথায়? আছে। যন্ত্রণা আছে। আর আছে বুকভরা দুঃখ। তাই সে এমন ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে এগিয়ে চলেছে। যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে। কেননা সে তো আসলে ফকির নয়! সংসারত্যাগী কোনো মানুষও নয়। সে আসলে বাদশা কাশিমের ছেলে। নিজেও সে একজন বাদশা। কিন্তু বাদশা হয়ে আর একজন বাদশার কাছে ছদ্মবেশ ধারণ করে যাচ্ছে সে কি কারণে! সেই কারণটা বলার জন্যই তো এত কথা। এত ভূমিকা! চলো আমরা ওর পেছনে পেছনে যাই। দেখি বাদশা হারুণ-অল-রসিদকে কি বলে সে! কিন্তু তাঁরও আগে তার কথাটা জানা দরকার কোন দেশের বাদশা সে? কেমন করেই বা চোখটা তার এমন হল?

তাকে জিজ্ঞেস করলে সে যা বলবে; তাই এখানে হুবহু বলে দিলাম। তার কথাটাই শোনো এবার—

আমি আসলে ফকির নই। এটা আমার ছদ্মবেশ। যাতে কেউ আমাকে চিনতে না পারে। আমি আসলে বাদশার ছেলে। বাদশা আবু কাসেমের পুত্র। পরে আমিও এক সময় বাদশা হয়েছিলাম। সিংহাসনে বসেই প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে আমি মন দিয়েছিলাম। এজন্য প্রজারা আমাকে ভালবাসত। আমার নামে জয় গান করত।

তখনও কিন্তু আমাব বাঁ চোখটা এমন নষ্ট হয়ে যায়নি। চোখটা

হারিয়েছি নিতান্ত নিজের দোষে।

সমুদ্রের ধারে ছিল আমাদের রাজধানী। তাই সমুদ্রকে ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসতাম। সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতাম। এটা আমার একটা শখ বলতে পারেন। তাছাড়া আমার রাজ্যের মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ ছিল। কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ সাজিয়ে মাঝেমাঝে আমি সেসব দ্বীপগুলোকে দেখতে যেতাম।

একবার এমনি বেরিয়ে পড়লাম ভীষণ ঝড়ের মুখে। সারাদিন সারারাত চলল ঝড়ের দাপট। সকালে উঠে দেখি কোথায় ঝড়! চারপাশে রোদ ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু জাহাজগুলো একটা ছোট্ট দ্বীপের চড়ায় আটকে আছে। সেখানেই দিনদুই বিশ্রাম নিয়ে একদিন আবার জাহাজ ভাসিয়ে দিলাম অজানা সমুদ্রে। এবার জাহাজ চলল তো চললই। কোনোদিকে কোনো তীরের চিহ্ন পেলাম না। সময়ের হিসেবে দেখলাম, প্রায় দিন কুড়ি পার করে দিয়েছি। মনে মনে ভয় হল। আবার সমুদ্রে ভেসে থাকার জন্য আনন্দও হল। কিন্তু জাহাজের কাপ্তানের মুখে দেখি দুশ্চিন্তার রেখা। চেনা পথের হদিশ না পেয়ে সে খুব চিন্তায় পড়েছে।

এভাবে আরও কয়েকদিন গেল। তীরের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। এক সকালে সমুদ্রকে বোঝার জন্য জলে একজন ডুবুরি নামালাম। সে জলের নিচে গিয়ে অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, এ সাগরে অনেক মাছ আছে আর অনেকটা দূরে আছে এক অদ্ভুত পাহাড়। সে পাহাড়ের অর্ধেকটা সাদা, অর্ধেকটা কালো।

তাই শুনে কাপ্তান আর্তনাদ করে উঠল, সর্বনাশ! কু-খ্যাত সেই

চুম্বক পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। আর আমাদের বাঁচায় উপায় নেই। এখুনি ওই পাহাড় আমাদের সব লোহাগুলো টেনে নেবে। তারপরেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে জাহাজগুলো। এই পাহাড়ের কাছে এর আগে যারাই এসেছে, তারা আর বাঁচেনি।

কথাগুলো শুনে আমি চমকে উঠলাম। কাপ্তানের গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল। সে আরও জানাল, ওই পাহাড়ের চুড়োয় দশটা পেতলের খুঁটির ওপর একটা গম্বুজ আছে। তার ওপরে একজন ব্রোঞ্জের দাঁড়ানো ঘোড়-সওয়ার। তার এক হাতে ঢাল। আর এক হাতে তলোয়ার। সারা গায়ে বর্ম আঁটা। লোকে বলে যতদিন ওই মূর্তি ওখানে থাকবে, ততদিন হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ যাবে। কিন্তু ওটাকে ওখান থেকে ফেলে দিতে পারলে আর ভয় নেই।

কথায় কথায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সে রাতটা ওভাবেই সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এগোলাম। আর নিজেদের নিয়তির কথা ভাবতে লাগলাম। পরের দিন সকালে উঠেই এক অদ্ভুত কাণ্ড। জাহাজটা হঠাৎ তীরবেগে জলের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। বুঝলাম, চুম্বক পাহাড় তাকে আকর্ষণ করেছে। একটু পরেই জাহাজটা ঠিক টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সব আশা ছেড়ে দিয়ে জাহাজেই নিশ্চুপ বসে রইলাম। আর একটু পরেই ভীষণ একটা শব্দ করে জাহাজগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কে যে কোথায় পড়ল তার ঠিক নেই। এমন কি প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় আমিও এক একবার তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আবার ভেসে উঠছিলাম ভুস করে। এভাবেই ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একসময়

ক্লান্ত হয়ে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি আমি সেই চুম্বক পাহাড়ের নিচের বালির ওপরে শুয়ে আছি। আশ্চর্য! ভাবলাম, আমি বেঁচে গেলাম কি করে। এত হাঙর, এত কুমীরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে এখানে এসে পড়লাম। বুঝলাম, আল্লার অসীম দোয়া। সে না বাঁচালে এই ভয়ংকর সমুদ্রে পড়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

যাই হোক উঠে বসে ততক্ষণে চারদিকটা দেখতে শুরু করেছিলাম আমি। আর বেখতেই চোখে পড়েছিল পাহাড়ে ওঠার সোজা একটা রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে একসময় ওপরে উঠে পড়লাম।

উঠতেই চোখে পড়ল একটা গম্বুজ। গম্বুজটা পেতলের। পেতলের গম্বুজ চোখে পড়তেই আমার জাহাজের কাপ্তানের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে তাকালাম। দেখি সত্যিই সেই মূর্তি। এক হাতে ঢাল। আর এক হাতে তলোয়ার।

সারা গায়ে বর্ম আঁটা। রোদ লেগে মূর্তিটা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই গম্বুজের নিচে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। মনে হল কে যেন আমার মাথার কাছে বসে বলছে ঃ শোনো কাসেমের ছেলে। তুমি ঘুম থেকে উঠলে তোমার পায়ের দিকটায় গর্ত খুঁড়ে দেখবে একটা তীর-ধনুক রয়েছে। সে দুটো তুলে নিয়ে ওই যে ঘোড়-সওয়ার মূর্তিটা দেখেছো তার বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে। তীর খেয়েই মূর্তিটা উল্টে পড়বে সমুদ্রে। তবেই অসংখ্য নাবিকের প্রাণ বাঁচবে। তবে হ্যাঁ—আর একটা কথা। মন দিয়ে শোনো—

তীর মেরেই ধনুকটাকে আবার আগের জায়গায় রেখে দেবে। তখন দেখবে সমুদ্রের জল বেড়ে পাহাড়ের চুড়োর সমান হয়েছে। আর তার ওপর দিয়ে একটা ছোট ডিঙি করে একজন লোক আসবে তোমার কাছে। তার মুখটাও ওই ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো। নৌকায় দেখবে রাশি রাশি মরা মানুষের মাথার খুলি। তুমি উঠে পড়বে। কোনো ভয় নেই। সে তোমাকে কিছু বলবে না। তবে হ্যাঁ—তুমি তার সঙ্গে কোনো কথা বলতে যেও না। আর আল্লার নাম কোর না। সে তাহলে তোমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তোমার দেশে পেঁছে দেবে। আবার বলছি ভুলেও তার সামনে আল্লার নাম কোর না।

আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। ধড়মড় করে জেগে উঠেই দিকে তাকালাম। তারপর মাটি একটু খুঁড়তেই সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে মজবুত একটা তীর-ধনুক পেয়ে গেলাম।

ধনুকটা তুলে তাতে তীর জুড়ে; এবার আমি স্বপ্নের শোনা কথা মত মূর্তিটার ঠিক নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তেই সেটা গিয়ে মূর্তিটার বুকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা উল্টে পড়ল সমুদ্রে। পড়তেই ভীষণ শব্দ করে সমুদ্রের জল ফুলে উঠতে লাগল। বাড়তে বাড়তে জলটা পাহাড়ের চুড়োয় এসে উঠতেই নজরে পড়ল একটা নৌকা আসছে। নৌকার ওপরে সেই ব্রোঞ্জওয়ালা মূর্তির মত একটা মূর্তি বসে। হাতে মড়ার মাথার খুলি।

ধনুকটা তাড়াতাড়ি যেখানে ছিল সেখানে পুঁতে দিয়েই নৌকায় উঠে বসলাম। মূর্তিটি আমায় কিছু বলল না। সাঁই সাঁই করে নৌকা এগিয়ে চলল। কয়েকদিন পরে দেখি আমার দেশের কাছে; চেনা সমুদ্রে এসে পড়েছি।

চেনা জায়গা দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। স্বপ্নের সাবধান-বাণী ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ আল্লা তোমার কি অপার মহিমা! তুমি ছাড়া উপায় নেই।

মুহূর্তেই সেই লোকটা বাঁহাতে করে আমাকে তুলে ধরে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপরেই সে যে কোথায় অদৃশ্য হল আমি বুঝতে পারলাম না।

হাবুডুবু খেতে খেতে আমি তখন সমুদ্রে ভাসছি আর আল্লার নাম ধরে তাকেই ডাকছি। দেখতে দেখতে একসময় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আর ঠিক সেই সময় মস্ত একটা ঢেউ এসে আমাকে হঠাৎ সমুদ্রের একধারে এক বালিয়াড়ির ওপরে পাঠিয়ে দিল। বেঁচে যেতে আমি আমার আল্লার নাম স্মরণ করলাম। তারপর ভিজে জামাকাপড় খুলে বালির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরেরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি চমৎকার এক দ্বীপ। সবুজ শস্য-শ্যামলা। ঘুরতে ঘুরতে একসময় আবার সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখুনি নজরে পড়ল একটা জাহাজ আসছে এদিকে। তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

জাহাজটি এসে এই দ্বীপেই নোঙর করল। তারপর কয়েকটা চাকর কোদাল হাতে নেমে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় গর্ত খুঁড়তে লাগল। খানিক বাদেই গর্তের ভেতর থেকে একটা লুকানো দরজা বেরিয়ে পড়ল। সেটা খুলে রেখে তারা আবার জাহাজে গিয়ে উঠল।

একটু পরে আবার জাহাজ থেকে নানা রকম সাজ-পোষাক, খাবার-দাবার নিয়ে নেমে এসে লোকগুলো ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর থুরথুরে বুড়ো আর অল্প বয়সী সুন্দর একটি ছেলেও জাহাজ থেকে নেমে ওই গোপন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। খানিকপরে আবার এই ছেলেটি ছাড়া সবাই বেরিয়ে এসে জাহাজে উঠল। শুধু চাকরগুলো দরজার মুখের মাটিগুলো সামনের দিকে চাপি করে উঁচু করে রাখল।

সব দেখে আমি তো অবাক। ওরা চলে গেলে আমি মাটি সরিয়ে দরজা খুলে; পাথরের সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলাম। ভেতরে চমৎকার এক প্রাসাদ। দরজায় মখমলের পর্দা ঝুলছে।

পর্দা সরিয়ে আরও ভেতরে যেতেই দেখি নানারকম দামী আস-বাবপত্রে সাজানো এক বৈঠকখানা। মাথার ওপরে ঝাড় লণ্ঠন। নিচে সোনার পালঙ্কে সেই ছেলেটি শুয়ে। সোনার হাত পাখা আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। সামনে থরে থরে সাজানো খাবার

কিন্তু লোকজন তেমন নেই।
আমার পায়ের শব্দে ছেলেটি টের পেয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। বেশ ভয় পেয়েছে দেখে আমিই তাকে অভয় দিয়ে বললাম, ভয় পেয়ো না। আমি একজন বাদশার ছেলে। জাহাজডুবির পর এই দ্বীপে ভাসতে ভাসতে এসেছি। কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো। এই মাটির নিচে তোমাকে মরতে দেবো না।
—না মালিক—ছেলেটি বলল, ওরা আমাকে মারার জন্য এখানে রেখে যায়নি। বরং আমাকে বাঁচাবার জন্যই এখানে রেখে গেছে। আপনি নিশ্চয়ই একজন বুড়ো লোককে দেখেছেন।
আমি ঘাড় নাড়তেই ছেলেটি বলল, উনিই আমার বাবা। পৃথিবীর সবচেয়ে একজন ধনী জহুরী। আমি জন্মাবার পর একজন গনৎকার বলেন যে মা-বাবা বেঁচে থাকতেই আমি মারা যাবো। আমার যখন পনের বছর বয়েস হবে, বাদশা কাসেমের ছেলে একটা চুম্বক পাহাড়ের ওপর থেকে এক ব্রোঞ্জের মূর্তিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নাবিকের প্রাণ বাঁচাবে। সেই বাদশার ছেলের হাতেই আমি মরবো। এখন সবাই বলছে, বাদশার ছেলে নাকি সেই মূর্তিকে ফেলে দিয়েছে জলে। কাজেই এখন আমার বিপদ। তাই আমাকে নিরাপদে রাখার জন্য আমার বাবার এই ব্যবস্থা। ঠিক চল্লিশদিন পরে বিপদ কাটলে তবে তারা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন।
শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, তাহলে তো আমিই সেই সেই ছেলে। আমিই সেই ঘাতক। কিন্তু বিনা কারণে এমন একটি ফুটফুটে ছেলেকে মারবো কেন আমি! আমার খুব রাগ

হল। ছেলেটিকে সাহস দিয়ে বললাম, না—না—তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তো আছি। দেখি বাদশা কাসেমের বেটা কি করে তোমার এখানে ঢোকে। আমি থাকতে তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না কেউ।

আমার কথায় ছেলেটি সাহস পেল। তারপর আমোদ-আহলাদে গানে-গল্পে চল্লিশটা দিন কেটে গেল। আজই এ-প্রাসাদে শেষ-দিন। বিকেলের দিকে ওর বাবা জাহাজ নিয়ে আসবে ওকে নিতে। স্নান করে সেজেগুজে সে তৈরী হয়ে রইল।

স্নান করে আসতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি খাবে তুমি বল ?

সে তরমুজের ইচ্ছে জানাতেই আমি একটা বড় পাকা তরমুজ নিয়ে এলাম। কিন্তু এতবড় তরমুজ কাটবো কি করে ? বেশ বড়সড় একটা ছুরি চাই। পালঙ্কের একপাশের দেয়ালের গায়ে বেশ বড় একটা ছুরি ঝোলানো ছিল। তরমুজ কাটার জন্য সেটাই নামিয়ে আনার জন্য পালঙ্কে উঠে সেটা সবে নামিয়ে এনেছি, এমন সময় ছেলেটি মজা করার জন্য আমার পায়ের তালুতে খুব সুড়সুড়ি দিল। চমকে উঠে পা সরাতে গিয়ে আমি আছাড় খেয়ে তার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হাতের ছুরিটা আমুল তার বুকের ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করতে করতে সে মারা গেল।

ঘটনাটা এমনিভাবে ঘটতে দেখে আমি অবাক। তারপরেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। একটু পরে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজার সামনে মাটিগুলো ঢিপি করে রেখে, গাছে চড়ে উঠে বসলাম।

খানিক বাদে জাহাজ এল। তারপর সেই ভয়ংকর দৃশ্যের কথা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। বুড়ো বাপ আর লোক-জন মাটি সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সেই দৃশ্য দেখে পাগলের মতো ছটফট করতে করতে উঠে এল তারা। তারপর ছেলেকে সেখানেই কবর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে জাহাজে উঠল।

আমি আর সেই ঘরে ঢুকলাম না। গাছের ওপরেই কয়েকদিন কাটালাম। ফলমূল খেয়ে, ঝরণার জল পান করে বেঁচে রইলাম। এরপর একদিন বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূরে গিয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড পেতলের প্রাসাদ। সামনে দশজন চমৎকার চেহারার লোক দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বাঁদিকের চোখটা কানা। তাদের পাশে এসে দাঁড়াল এক থুরথুরে বুড়ো। তারা আমার দুঃখের কাহিনী শুনে আমাকে আদর করে খুব সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে বসাল। অনেক কিছু খাওয়াল।

পরের দিন সকালে আমি আর কৌতুহল চাপতে না পেরে আমি

ওদের কাছে জানতে চাইলাম, ওদের প্রত্যেকের একটা করে চোখ কাণা কেন? ওরা প্রথমে বলতে চাইল না। কিন্তু আমি জেরাজুরি করতে বলল, এ কাহিণী শুনলে আমাদের মত তোমারও কিন্তু বাঁচোখটা কানা হয়ে যাবে।

—হয় হোক। তবু তোমরা আমাকে তোমাদের কাহিনী বল।

আমার জেদ দেখে ওরা রাজী হল। বলল, ঠিক আছে বলছি সে কাহিনী। তবে এ কাহিনী শুনে তোমারও একচোখ কাণা হলে তুমি কিন্তু এখানে থাকতে পারবে না। কেননা এখানে দশজনের বেশি জায়গা নেই।

আমি তাতেও রাজি হলাম দেখে সেই বুড়ো লোকটা বড় একটা ভেড়ার চামড়া নিয়ে এল। তারপর বলল, এই ভেড়ার চামড়ার ভেতরে তুমি একটা ছুরি নিয়ে ঢুকে যাও। আমি তারপর চামড়াটা সেলাই করে পাহাড়ের চুড়োয় রেখে আসব। আর এই জিনিসটা দেখে রকপাখি ভাববে কোনো খাবার জিনিস। সে সেটাকে পায়ে তুলে নিয়ে তার বাসায় নিয়ে যাবে। বাসায় পেঁছলেই তুমি চামড়া কেটে বেরিয়ে আসবে। ভয় নেই। রকপাখি তোমাকে দেখেই উড়ে পালাবে। কেননা ওরা মানুষ খায় না।

তখন তুমি বাসা থেকে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করবে। কিছুক্ষণ পরে এর চেয়েও দশগুণ বড় খুব সুন্দর আশ্চর্য এক প্রাসাদে পেঁছবে। সেখানেই জানতে পারবে আমাদের চোখ কি করে গেল।

তারপর এদের কথামত সব ঘটনাই ঘটল। রকপাখি ওর বাসায় পেঁছতেই আমি ছুরি দিয়ে চামড়া কেটে বেরিয়ে এলাম।

খানিকটা যেতেই দেখি সেই আশ্চর্য প্রাসাদ। কাণা যুবকরা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। অসংখ্য চন্দনকাঠের দরজা পার হয়ে, মণিমানিক্য দিয়ে সাজানো একটা ঘরে এলাম।

সেখানে যেতেই চল্লিশজন পরমা সুন্দরী মেয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আদর করে বসাল। তারপর আমার গায়ে নানা সুগন্ধী ছড়িয়ে দিয়ে নানান জিনিস খাইয়ে; তারা আমাকে নাচ দেখাল, গান শোনাল। আর আমি তাদের বললাম, আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতর গল্প।

এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। তারপর মেয়েগুলো কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। জানাল, তাদের বাবা সেখানকার শাহেনশা। মেয়েরা সারা বছর এই প্রাসাদে থাকে। শুধু বছরের শেষে চল্লিশটা দিন মা-বাবার কাছে ফিরে যায়। আবার নতুন বছরে এখানে ফিরে আসে।

চলে যাবার সময় তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কোথায় যাবো। আমি সেখানে থাকবো জানাতেই তারা খুশি হয়ে আমাকে এক গোছা চাবি দিল। বলল, এ বাড়ির সব দরজার চাবি আছে এখানে। ঘর খুলে দেখো! খালি একটা দরজা খুলো না। বাগানের ওপাশে যে তামার দরজাটা দেখছো সেটা। ভুলেও ওটা কখনো খুলে দেখো না। তাহলে আর আমাদের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না।

তারা চলে যেতেই আমি একে একে সব দরজা খুললাম। প্রথমটা খুলে দেখি—অপূর্ব এক ফলের বাগান। দ্বিতীয়টা খুলে দেখি—আশ্চর্য সুন্দর ফুল-বাগিচা। তৃতীয়টায়—শুধু পাখি আর পাখি। এমনি প্রতিটি দরজা খুলে ধন-দৌলত আর চোখ

ধাঁধানো নানা সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে বড় লোভ হয় তামার দরজাটা খুলে দেখতে। কিন্তু কয়েকবার খুলতে গিয়েও মেয়েদের কথাগুলো মনে পড়ায় খুললাম না। চাবি লাগিয়ে দরজাটা খুলে দেখলাম।

দেখতেই অন্ধকার। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। তবে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। সে গন্ধে একটু পরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম আমি। জ্ঞান হতেই দেখলাম একটা প্রকান্ড ঘরে শুয়ে আছি আমি। সে ঘরের চারদিকে চারটে সোনার প্রদীপ জ্বলছে। সুগন্ধে ঘরটা ভরে উঠেছে। আর ঘরের

মাঝখানে সুন্দর একটা কালো ঘোড়া। যেমন তেজী তেমনি তেল চকচকে শরীর। কপালে একটা তারার চিহ্ন। পিঠে অপূর্ব কারুকার্য করা সোনার রেকাব আর জিন।

দেখেই লোভ হল। ভাবলাম, একটু চড়ে দেখি। ভাবতে না ভাবতেই উঠলাম। বাগানের দিকে নিয়ে এলাম। কিন্তু তারপর আর নড়ে না। আমি ওর পিঠে উঠে বসেই যেই না একটু গুঁতো দিয়েছি, অমনি চি—হি—হি করে ডেকে উঠে ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে আকাশে উঠল। বুঝলাম, এটা পক্ষীরাজ।
উড়তে উড়তে সেই তামার প্রাসাদের ছাদে গিয়ে দাঁড়াল পক্ষীরাজ। তারপর এক ঝটকায় আমাকে প্রাসাদের সামনে নামিয়ে দিয়ে আবার আকাশে উড়ল। কিন্তু কি বলব—ওড়ার সময় ডানার একটা ঝাপটায় আমার বাঁদিকের চোখটাকে কাণা করে দিয়ে গেল।
আমার অবস্থা দেখে সেই দশজন কাণা যুবক বেরিয়ে এল। বলল, কেমন হল! তো? বলেছিলাম, শুনতে চেয়ো না। এখন দেখলে তো?
আমি ততক্ষণে বাঁদিকের চোখটায় হাত দিয়ে চেপে ব্যথায় কাতর হয়ে বসে পড়েছিল। কাণা যুবকরা বলল, যাই হোক। তোমার কিন্তু এখানে থাকা হবে না বাপু। তার চেয়ে এক কাজ কর। সামনের ওই রাস্তা ধরে এগোলে কয়েকদিনের মধ্যে বাগদাদে পেঁছিতে পারবে। সেখানে গিয়ে বাদশা হারুণ-অল-রসিদের সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন।
অতঃপর সেই থেকেই ফকিরের ছদ্মবেশে হাঁটছি। আসছি আমি অনেক দূর থেকে। যাবো বাদশা হারুণ-অল-রসিদের কাছে। হারুণ-অল-রসিদের প্রাসাদটা কোনদিকে বলতে পারেন?

জুবেদা ও দুই কুকুরীর গল্প

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসনকর্তাই খুব দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সেকালে বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মত এমন ক্ষমতাশালী, গুণী; দয়ালু আর প্রজাবৎসল শাসনকর্তা সারা দুনিয়ায় আর ছিল কিনা সন্দেহ। আগেই বলেছি গভীর রাতে ছদ্মবেশে তিনি রাস্তায় বেরোতেন। সঙ্গে থাকত তাঁর উজীর জাফর আর একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর মসরু। বেরোতেন তিনি নগর দেখতে! ভাবতেন; কে জানে কোথাও কোনো দুঃখী মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে কিনা!

একরাত্রে ওই রকম তিনি বেরিয়েছেন সঙ্গীদের সঙ্গে। নগরের

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় বড় একটি বাড়ির ভেতর থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি।

এত রাত্রে গান শুনে খলিফার বড় কৌতূহল হল। জাফরদের নিয়ে তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

খলিফার নির্দেশে জাফর গিয়ে কড়া নাড়লেন। নাড়তেই একটু পরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। উজীর মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আমরা তিবারিয়া দেশের সওদাগর। রাতের অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আজ রাতের মত যদি এখানে একটু আশ্রয় পাওয়া যায়, তবে বড় কৃতজ্ঞ থাকব।

শুনে মেয়েটি জাফরকে দাঁড়াতে বলে একবার ভেতরে গেল। তারপর আবার বেরিয়ে এসে বলল, আসুন আমার দিদিদের জিজ্ঞেস করে এসেছি। তারা আপনাদের ভেতরে আসতে বলেছেন।

ভেতরে ঢুকতেই আরও দুজন রূপসী মেয়ে ওদের অভ্যর্থনা করে বলল, আপনারা আজ রাতে আমাদের অতিথি হয়ে থাকলে বড় খুশি হব। তবে সেই সঙ্গে দরজার ওপরে লেখা ওই কথাগুলোও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে আপনাদের। এখন দেখুন তা পারবেন কি না? পারলে থাকুন।

উজীর জাফর সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। দেখলেন, দরজার ওপরে সোনার অক্ষরে লেখা: "তোমার ভাল লাগল কি না সেটা বড় কথা নয়। আমরা যা বলব তাই মেনে নিতে হবে। আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো চলবে না।"

লেখাটা পড়ে ফিরে এসে জাফর বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে এতে

আমাদের আপত্তি নেই।

বলে কথাগুলো খলিফা আর মসরুকে জানিয়ে সবাই মিলে ভেতরে ঢুকল। ঘরে আরও চারজন লোক ছিল। এঁরা তিনজন তাদের পাশে বসলেন। বসতে না বসতেই নানারকম খাদ্য ও পানীয় এল। যে এক এলাহী আয়োজন। কিন্তু খলিফা বললেন, আমি হজ-যাত্রী। মদ ছুঁই না। ফল, মিষ্টি ও সরবতে আমার আপত্তি নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর মেয়ে তিনটির মধ্যে যে বড় সে এবার ঘরের ভেতরে বসা এক অল্পবয়েসী ছেলেকে ডাকল। ছেলেটির গায়ে খুব শক্তি। খলিফাদের মত সেও বাইরের লোক। রাস্তার মজুর। একটু আগেই তিনবোনের ছোট বোন বাজারে গিয়ে এই ছেলেটির মাথায় সওদা চাপিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সেই থেকে এই মজুর ছেলেটিও বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। বড়বোনের কথায় সে এবার উঠল।

বড়বোন বলল, এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে।

বলে পাশের ঘর থেকে শেকল দিয়ে বাঁধা দুটো কুকুরীকে টানতে টানতে ঘরের ভেতরে নিয়ে এসে সেই ছেলেটির হাতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে ববল, এবার এই কুকুরীটাকে জোরে জোরে চাবুক লাগাও।

এ বাড়ির নিয়ম সব কথা মেনে চলতে হবে। কেউ কিছু বলতেও পারবে না। কাজেই মজুর ছেলেটিও এই আদেশ অমান্য করল না। শপাং শপাং করে কুকুরটির গায়ে সামনে সমানে চাবুক লাগাতে লাগল। কুকুরটি ডুকরে কেঁদে উঠল। চোখ থেকে জল

গড়িয়ে পড়ল। জল শুধু কুকুরটির চোখেই নয়; ঘরে যারা উপস্থিত ছিল তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল এসে গেল। তবু কারো মুখে সাড়া নেই।
একটু পরে বড় বোন ছেলেটিকে থামতে বলল। ছেলেটি থামলে বড়বোন কুকুরটিকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগল।
খানিক বাদে এরপর আর একটা পালা। সেটাকেও প্রথমে চাবুকের শপাং শপাং বাড়ি। তারপর আবার বড় বোনের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর।
ঘরের সবাই ততক্ষণে ছটফট করে উঠেছে মনে মনে। প্রত্যেকেরই কৌতূহল। কেন—কেন ওই কুকুরী দুটোকে অত মারা হল? মারাই যদি হল তবে আবার অত আদর কেন?

খালিফা হারুণ-অল-রসিদও কথাটা ফিস ফিস করে কয়েকবার উজীর জাফরকে বলেছে। বলেছে; এর কারণ কি বড় বোনকে জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু জাফর তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, না না জাঁহাপনা কথার খেলাপ করবেন না। ঘরে ঢোকার আগেই দরজার ওপরের কথাগুলো মেনে চলব বলেই শপথ নিয়েছিলাম। কাজেই এখনতো এসব জিজ্ঞেস করা চলে না।
খলিফা তখন বললেন, তাহলে এক কাজ কর জাফর। কাল দুপুরের দরবারে ওই মেয়ে তিনটি; কুকুরী দুটো আর আজ যারা এখানে উপস্হিত আছে; তাদের সবাইকে সেখানে হাজির কোর। ওদের কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। নিশ্চয়ই এর ভেতরে কোনো রহস্য ছড়িয়ে আছে।

পরদিন দুপুরেই খলিফার কথামত সবাইকে দরবারে হাজির করলেন জাফর।

মেয়ে তিনটি মাথা নীচু করে বসে রইল। জাফর বললেন, তোমরা জানো। ইনি হলেন বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ। আমি তাঁর উজির জাফর। আর এ হল তাঁর তলোয়ার বাহক মসরুর। বলে মসরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জাফর আবার বলতে শুরু করল; কাল রাতে তোমাদের বাড়িতে আমরা অতিথি হয়েছিলাম। অবশ্য তোমরা তখন আমাদের পরিচয় জানতে না। তাছাড়া তোমরা কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করনি—এক ওই কুকুরী দুটো ছাড়া। এখন খলিফা তোমাদের দরবারে ডেকেছেন ওই কুকুরীদুটি ও তোমাদের রহস্যময় কাহিনী শোনার জন্য। আশাকরি তোমরা সত্যি কথাটাই বলবে।

বড় বোন এবার এগিয়ে এসে বলল; মহামন্য শাহেন শা না জেনে কাল হয়ত অনেক অন্যায়ই করে ফেলেছি আপনাদের ওপর। সেজন্য প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনি যে আমাদের কাহিনী শুনতে চেয়েছেন তাও আপনাকে শোনাচ্ছি। যা যা যেমন যেমন ঘটেছিল প্রথম থেকে তাই তাই আপনাকে বলছি শুনুন।

এই বলে বড় বোন বলতে শুরু করল।

জাঁহাপনা আমার নাম জুবেদা। আর এই যে সঙ্গে দুজন মেয়ে দেখছেন—এরা আমার বৈমাত্রেয় বোন। নাম আমিনা আর ফাহিমা। এরা ছাড়াও আমার মায়ের আরও দুই দিদি আছে। বাবা মারা যাওয়ার সময় পাঁচ হাজার দিনার রেখে গিয়েছিলে। আমিনা; ফাহিমা তাদের তাদের অংশ নিয়ে তাদের মায়ের কাছে চলে গেল। আর আমরা তিন বোন এক বাড়িতেই রইলাম। আমাদের মা তো আগেই মারা গেছে। কিছুদিন পরে দিদিরাও বিয়ে করে যে যার ভাগের টাকা নিয়ে, তাদের স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বাণিজ্য করতে চলে গেল।

আমি দেশে থেকে আমার ভাগের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে তা অনেকগুণ বাড়ালাম। আমার অবস্থা কয়েক বছরের মধ্যেই পাল্টে গেল। শহরে আমি তখন রীতিমত ধনী-মহিলা। কিন্তু কিছুদিন পরে একটা ঘটল। প্রায় বছর চারেক বাদে আমার দুই দিদি বিদেশ থেকে সর্বস্ব খুইয়ে আমার বাড়িতে এল। তাদের দেখে আর চেনা যায় না। এত খারাপ চেহারা। শুনলাম, বিদেশের কোন অচেনা বন্দরে তাদের স্বামীরা তাদের ফেলে রেখে সব টাকা পয়সা ও গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়েছে। তারপর অনেক কষ্টে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তারা দেশে ফিরেছে। তাদের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। মা নেই। বাবা নেই। এখন আমি ছাড়া আর তাদের আছে কে! ভাবতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নিয়ে গেলাম তাদের।

কিছুদিন আমার কাছে থাকার পর ভাল খেয়ে দেয়ে আর পুরো-পুরি বিশ্রাম নিয়ে তাদের চেহারায় আবার আগের মত জেল্লা

ফুটে উঠল। তারা হয়ে উঠল আবার আগের মতই সুন্দর।
আমি আমার লাভের টাকার দু'ভাগ ওদের দিলাম। ভাবলাম—এখানে থেকেই এবার স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক ওরা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দিদিরা আবার নিজেদের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। আমার কথা কোনো রকম শুনল না। এবারও বিয়ে করে টাকা পয়সা নিয়ে তাদের স্বামীদের সঙ্গে বিদেশে বাণিজ্য করতে চলে গেল।

তারপর আবার সেই একই ঘটনা। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আবার ফিরে এসে আমার পায়ে পড়ে বলল, আশ্রয় দিতে। আর তারা কোনোদিন বিয়ের ব্যাপারে নাক গলাবে না।

কি করব! শত হলেও তো আমারই মায়ের পেটের বোন। আবার আশ্রয় দিলাম। ভাল খেয়ে দেয়ে, ভালমত থাকতে পেরে আবার তারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে আমার বাণিজ্যে যাওয়ার দিন ঠিক হল। আমি ওদের জানালাম, আমি বিদেশে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে ওরা আমার সঙ্গে যেতে পারে। আর তা না হলে বাড়িতেই থাকতে পারে।

দিদিরা বলল, তারাও আমার সঙ্গে যাবে। যাবে শুনে আমি একটা কাজ করলাম। আমার সমস্ত টাকা পয়সাকে দুভাগ করে করে একভাগ বাড়ির ভেতরেই একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম। আর বাকি অংশ নিয়ে বাণিজ্যে বেরোলাম। কি জানি কেন মনে হয়েছিল, এমন করাই বুদ্ধির কাজ হবে। তাই এটা করেছিলাম। তাছাড়া বাণিজ্যে গিয়ে কার কপালে কি আছে কে বলতে পারে।

নির্দিষ্ট দিনে দিদিদের নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ভাল বাতাস পেয়ে জাহাজ ছাড়ল। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, সমুদ্র কী শান্ত আর আকাশ কী সুন্দর! ভাবলাম, যাক যাত্রাটা এবার ভালই হল মনে হচ্ছে।

কিন্তু কে জানে এমন অবস্থা হবে। কিছুদিন পরেই জাহাজ এমন জায়গায় এসে রড়ল যে চারদিকেই শুধু জল। দিনের পর দিন অবিরাম ভাসতে ভাসতেও কোনো তীরের চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কথা বললাম। সেও বেশ ভয় পেয়েছে মনে হল। জানালে, যেখানে এসেছে এই সমুদ্রও তার অচেনা জায়গা।

কি আর করব। আল্লার দয়ার ওপর নির্ভর করেই ভাসতে লাগলাম। এভাবে আরও দুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ এক সকালে তীরের চিহ্ন পেলাম। মাটি দেখেই মনটা নেচে উঠল। ভাবলাম, হোক অচেনা দেশ। তবু তো লোকজন আর তীরের চিহ্ন পাওয়া গেল। এখানেই না হয় জিনিসপত্র বেচা যাবে। আবার নতুন জিনিসও কিনে জাহাজে তোলা যাবে।

কিন্তু তীরে নেমেই অবাক কাণ্ড। এ দেশে লোকজন কোথায়। ঘর বাড়ি দোকান পাট সবই সাজানো রয়েছে। কিন্তু লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? তাছাড়া পাথুরে কালো মাটি। এ মাটিই বা কিরকম? হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে ভেতরের দিকে যেতে লাগলাম। যতই যাই ততই অবাক হই। একটাও লোক নেই। বাজার হাট সব সাজানো অবস্থায় পড়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই রাস্তার বাঁক নিতেই চোখে পড়ল একটা

প্রকাণ্ড বড় প্রাসাদ। আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরী। দরজায় মখমলের সুদৃশ্য দামী পর্দা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি। বলতে ভুলে গেছি, জাহাজ থেকে নেমে আমরা কয়েকজন সেই রাস্তার বাঁকের কাছে এসে এক একজন একদিকে এগিয়ে গেছি। ভেবেছিলাম, যার চোখে যা পড়ে এভাবে সমস্ত দেশটাকে মোটামুটি আমরা তাহলে দেখে নিতে পারবো। সেই ভাবেই আমার সঙ্গের লোকজন চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে আমার চোখে ওই প্রাসাদটা নজরে পড়ায় আমি সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর পর্দা সরিয়ে ভেতরে যেতেই তো আমার অবাক হওয়ার পালা। সামনেই বিশাল একটা দরবার ঘর। দামী দামী আসবাবে সাজানো ঘরের এক কোনায় অপরূপ সুন্দর মণিমাণিক্যে কারুকাজ করা একটা সোনার সিংহাসন। তাতে বাদশা বসে আছেন। চারদিকে আমীর-ওমরাহ লোক-লস্কর আর সভাসদ্। কিন্তু তারা সবাই পাথরের মূর্তি'র মত। নড়েও না চড়েও না। কথা বলা তো দূরের কথা।

ভারী অদ্ভুত লাগল। পায়ে পায়ে আরও ভেতরে গেলাম। উঠলাম গিয়ে অন্দর মহলে। সেখানেও দেখি তাই। সোনার পালঙ্কে বেগম শুয়ে আছেন হীরে জহরৎ পড়ে। তার চারদিকে সখী, বাঁদী, আর অসংখ্য সুন্দরী যুবতী দাসী। কিন্তু সবাই পাথর।

মহলের পর মহল ঘুরলাম। লোকজনে ঠাসা পুরী। কিন্তু কারও দেহে প্রাণ নেই। তবুও দেখতে দেখতে আরও এগিয়ে গেলাম।

এক জায়গায় এসে দেখি একটা সুন্দর মখমলের নরম বিছানা।

মনে হল হয়ত এখানে বাদশা শুয়ে থাকেন। বিছানাটা দেখেই আমার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। আল্লার নাম করে একসময় সেখানে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে পড়েও ঘুম এল না। হঠাৎ কানে এল কে যেন গম্ভীর সুরে কোরাণ পড়ে চলেছে। উঠে এগিয়ে গেলাম। শব্দ লক্ষ্য করে যেতেই চোখে পড়ল, অদূরে পরমসুন্দর এক যুবককে। একটা কম্বল বিছিয়ে তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে একমনে কোরাণ পড়ে চলেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পড়া শেষ হলে তার সঙ্গে পরিচয় হল। আমি নিজের কথা বললাম। তারপর জানতে চাইলাম এই পুরীর কথা। যুবক বলল, ওই বাদশা-বেগম তার বাবা-মা। তিনিই এখানকার শাহজাদা। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। সবার চোখের মণি।

কিন্তু তাদের এ-অবস্থা হল কেন জিজ্ঞেস করতেই শাহজাদা বলল সে ভয়ংকর ইতিহাস। সেই কাহিণী শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শাহজাদার কাহিণীটা এরকম।

সে দেশের বাদশা ভারী প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁর অনেক গুণও ছিল। কিন্তু আল্লাকে মানতেন না। তিনি ছিলেন শয়তান

নারদুনের ভক্ত। শুধু তিনিই নয়। দেশের সমস্ত প্রজা থেকে বেগম পর্যন্ত সবাই ছিল ওই শয়তানের ভক্ত। একমাত্র প্রাসাদে এক জ্ঞানী বুড়ি ছিল আল্লার উপাসক। কিন্তু তা কেউ জানত না। এদিকে ছেলেবেলা থেকে তার কাছেই মানুষ হওয়ায় শাহজাদাও হয়ে উঠেছিল আল্লার পরম ভক্ত। নিয়ম করে সে কোরাণ পড়তে শিখল। নামাজ পড়তে শিখল। কোরাণ ছিল তার মুখস্ত।

একদিন সেই বুড়ি মারা গেল। বুড়ি মারা যাওয়ার পর শাহজাদা গোপনে গোপনে নিজেই আল্লার নাম করত। নামাজ পড়ত। এদিকে দেখতে দেখতে সে দেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল পাপ। লোকেরা ক্রমশঃ পাপের পথে নেমে যাচ্ছিল। একদিন আকাশ পথে আল্লার কাছ থেকে দৈববাণী এল ঃ এখনো সময় আছে। নারদুনের অভিশপ্ত ছেড়ে দিয়ে তোমরা সৎপথে এসো। নাহলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।'

কিন্তু কেউ তেমন গা করল না। কিছুদিন পরে আবার সেই দৈববাণী। ভয়ে প্রজারা এবার বাদশার কাছে ছুটে গেল। বাদশা তাদের অভয় দিলেন। বললেন, কোনো ভয় নেই। এ সব আল্লার ছলাকলা। নারদুন তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা ফিরে যাও।

প্রজারা ফিরে গেল। দুবারের পর তিনবারও ওই রকম দৈববাণী হল আকাশ পথ থেকে। প্রজারা তবু পাপের পথ থেকে সরল না। বাদশা ও আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন নারদুনের ছলেকলে।

এরপর একদিন সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল। আকাশে প্রকান্ড এক উল্কা দেখা দিল। তারপর একটা বিদ্যুৎ ঝলকে উঠেই নিভে

গেল। আর সেই ঝলসানো বিদ্যুতের আলোতে দেশ শুদ্ধ সব লোক পাথর হয়ে গেল। হল না শুধু শাহজাদা। কেন না সে তো ছিল আল্লার প্রকাণ্ড ভক্ত। পরম উপাসক। সেই থেকে এই অভিশপ্ত পুরীতে শাহজাদা একাই কাটিয়ে দিয়েছেন। দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, তবু উপায় নেই। সবকিছু সহ্য করেই এতদিন কাটিয়ে ছিলেন। কথা বলতেও পারেন নি। আজ এত বছর পরে তিনি কথা বলতে পারলেন।

সব শুনে আমি তাকে আমাকে বিয়ে করে মর্তের স্বর্গ বাগদাদে যেতে বললাম। সে রাজী হল। তারপর এক সকালে প্রাসাদ থেকে দামী দামী সব জিনিসপত্র এনে জাহাজে তুলে শাহজাদাকে নিয়ে আমি রওনা হলাম।

জাহাজে আমার অনুপস্থিতে সবাই খুব চিন্তায় পড়েছিল। যারা যারা আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল তারাও ফিরে এসেছিল। এমন কি আমার দুই দিদি আমার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে দুদিন প্রায় মনমরা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে তারা যারপরনাই আনন্দিত হল। কিন্তু শাহজাদাকে দেখে বেশ অবাকও হল। আমি তখন সব ঘটনা জাহাজের সবাইকে খুলে বললাম। বলতেই সবার খুব আনন্দ হল। একমাত্র আমার দুই দিদি ছাড়া। তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। বুঝলাম, হিংসায় বুক ফেটে যাচ্ছে তাদের। আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষায় জ্বলতে শুরু করেছে তারা। শুধু তাই নয়, মনে মনে বদবুদ্ধিও চালাতে লাগল তারা। একরাত্রে আমি আর শাহজাদা ঘুমিয়ে আছি ঃ তারা আমাদের দুজনকে ধরেই সমুদ্রে ফেলে দিল। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেতেই চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। দেখি, জলের ভেতরে

হাবুডুবু খেতে শুরু করেছি। শাহজাদাকে দেখলাম হঠাৎ কোথায় যেন তলিয়ে গেল আর উঠল না। তা দেখে আমার চোখে জল নেমে এল। শোকে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণ পরে ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের মাথায় উঠতে আর তলিয়ে যেতে যেতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি একটা দ্বীপের ওপরে শুয়ে আছি। আশেপাশে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। হঠাৎ দেখি একটা পায়ে চলা পথ। ভাবলাম, রাস্তাটা হয়ত কোনো গ্রামের ভেতরে চলে গেছে। ভাবতেই এগোলাম।

কিন্তু একটু বাদেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। একটা প্রকাণ্ড সাপ একটা ছোট্ট সাপকে তাড়া করে যাচ্ছে। হঠাৎ কী মনে হল। হাতের সামনে একটা বড় পাথর পেয়ে তাই তুলে বড় সাপটার মাথা লক্ষ্য করে পাথরটা ছুড়লাম। মুহূর্তেই বড় সাপের মাথাটা থেঁতলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার! ছোট সাপটার দুপাশে দুটো পাখা গজাতেই সেটা আকাশে উড়ে মিলিয়ে গেল।

বড় সাপটাকে দেখি মরে পড়ে আছে।

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটু বিশ্রাম নেব মনে করে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। বসতে না বসতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই।

ঘুম ভাঙলে দেখলাম একজন রূপসী আমার পা টিপছে। তার গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম; না—না একি! তুমি আমার পা টিপছ কেন?

সে বলল; আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। তাই সে আমার পা টিপছে।

আমি অবাক হতেই সে বলল; বুঝতে পারলেন না তো! আমিই সেই ছোট সাপ। আসলে আমি সাপও নই। আমরা দুজনেই জিন। একজন মরেছে। আর এর হাত থেকেই আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। সেজন্য আমিও আপনার জন্য অনেক কিছু করেছি। আমরা সর্বজ্ঞ—এটা নিশ্চয়ই জানেন। কোথায় কি হচ্ছে সব জানতে পারি। এমন কি আপনি যখুনি আমাকে বাঁচালেন তক্ষুণি আমি আপনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি আপনার দুঃখের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের ধরে এনে দুটো কুকুরী করে ওই দেখুন ওই গাছে বেঁধে রেখেছি। এখন আপনি যদি বলেন তবে আমি আবার ওদের আগের মত অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।

আমি—'না—'জানাতেই সে বলল, এমন কি বাড়ি ফিরেও ধন-দৌলত নিয়ে আপনার জাহাজ ঠিক ঠিক পেঁছে গেছে।

এবার আমি আর্তনাদ করে বললাম; কিন্তু শাহজাদা!

রূপসী বলল; না তাকে আর পাবে না। কারণ তার আয়ু শেষ হয়েগিয়েছিল।

এ কথায় আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। রূপসী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শোনো একটা কথা তোমায় বলি। এখন থেকে রোজ রাত্রে এই কুকুরী দুটোকে তিনশো ঘা করে চাবুক মারবেন। যদি না মারেন আমি ফিরে এসে ওদের তক্ষুণি মানুষ করে দেব। এভাবে মারতে মারতেই ওদের স্বভাব পাল্টাবে।
বলে রূপসী এক বগলে আমাকে আর এক বগলে কুকুরী দুটোকে এক নিমিশেই আমাদের বাগদাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মহামান্য শাহেনশা সেই থেকেই রোজ রাত্রে আমি ওদের তিনশো ঘা করে চাবুক মারি। এই আমার কাহিনী।
কাহিনী শেষ করে বড়বোন এবার খলিফার দিকে তাকালেন।

খলিফা বললেন, তোমার জীবনের কাহিনী বড়ই অদ্ভুত। খুবই করুণ। এখন বল দেখি যে রূপসী যিনি তোমার দিদিদের কুকুরী বানিয়ে রেখেছেন তাকে ডেকে আনা যায় কি না ?

জুবেদা বলল, হ্যাঁ তা যায়। আমাকে সে বলেছিল; যদি কখনো আমার দরকার হয়; তাহলে আমার মাথার দু'গাছি চুল পোড়ালেই সে আসবে।

খলিফার হুকুমে জুবেদার দু গাছি চুল পোড়ান হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দরবারের এক কোণে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণের রূপসী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বুঝল এই সেই জিন।

জুবেদা তাকে কাছে ডেকে আনলে; সে খলিফাকে সেলাম জানাল। খলিফা তাকে আশির্বাদ করলেন। তারপর জিনি বলল; আমি জানি আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন। ঠিক আছে আপনি যদি বলেন তবে এই কুকুরী দুটোকে আমি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি।

খলিফা বললেন; হ্যাঁ তাই দাও। আমার মনে হয় এতদিন রোজ চাবুক খেতে খেতে ওরা এখন অনুতপ্ত। নিজেদের স্বভাব নিশ্চয়ই পাল্টে গেছে এতদিনে। আর মনে হয় এমন কাজ করবে না ওরা।

তখন একটা বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে মন্ত্রপূত করে তা থেকে কিছুটা নিয়ে কুকুরী দুটোর গায়ে ছিটিয়ে দিতেই তারা আবার আগের সুন্দরী মেয়ে হয়ে উঠল। তখন তাদের চোখে জল। বেশ বোঝাযায়; এতদিনে নিজেদের স্বভাব চরিত্র বদলেছে তারা।

তখন খলিফা তার মৌলভিকে ডাকিয়ে, জুবেদা ও তার দুই

দিদির সঙ্গে সেই রাত্রে উপস্থিত সেই তিন ফকিরের—যারা আসলে ফকির নয়, বাদশারই ছেলে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। মেজো বোনের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন। আর ছোট বোনকে বিয়ে করলেন তিনি নিজে।

তাছাড়া প্রত্যেকের জন্য বাড়ি তৈরী করে, এত ধন দৌলত দিলেন যে সারাজীবন তারা সুখেই কাটাল।

বাগদাদের বুলবুল ও যাদু ফুলদানী

অনেক কাল আগে বাগদাদ শহরের এক প্রান্তে এক তাঁতী বাস করত। তাঁতীর তিন মেয়ে ছিল। তিন তিনটি মেয়েই ছিল দেখতে পরমা সুন্দরী। বিশেষ করে ছোটটি। যেমন তার গুণ, তেমনি তার রূপ। তার রূপ দেখে যেন পশুপাখিও তার দিকে তাকিয়ে থাকত।

শহরে একবার খুব মহামারী দেখাদিল। তাতেই তাঁতী আর তার বউ একদিন মারা গেল। তাঁতী তো মারা গেল—এখন তাদের খাওয়াবে কে? মেয়েরা একেবারে নিষ্কর্মা ছিল না। তারা শনের কাপড় বুনতে পারত। ফলে তাঁতীর মৃত্যুর পরে তিনজনে মিলে ঠিক করল, তারা কাপড় বুনে বিক্রী করেই সংসার চালাবে।

যেমন ভাবা তেমনি শুরু হল কাজ। রোজ রোজ নতুন নতুন কাপড় বোনে আর তা বিক্রী করে সেই টাকা দিয়ে তারা সংসার চালায়। এমন করেই চলছিল।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল যে ছোট বোনের তৈরী কাপড়ই লোকে বেশি পছন্দ করছে। তার কারণও ছিল। ছোট বোনের কাজ এত নিখুঁত আর এত সুন্দর ছিল যে, যেই দেখত সেই তা হাতে তুলে নিত। প্রশংসা করত। বড় বোনেরা তাই হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরত। ছোট বোনটার কাপড় কেন এত ভাল হবে? লোক কেন এত প্রশংসা করবে। ওকেই কেন ভাল বলবে?

হিংসা চপতে না পেরে, কথায় কথায় ওরা ছোটবোনকে খোঁটা দিত। ভাল খেতে পারতেও দিত না।

একদিন ছোটবোন, অনেক ভাল ভাল কাপড় বুনে, লাভ করে বাড়িতে ফিরে এল ছোট একটা অপূর্ব ফুলদানি হাতে করে।

ফুলদানি দেখেই তো দিদিদের চোখ চড়কগাছ। খুব আচ্ছা করে ফুলবানুকে বকল তারা। বলল, লজ্জা করে না তোর সংসারের পয়সা এভাবে নষ্ট করিস। ইস্ ভারী তো দেখতে। তার ওপর আবার একটা ফুলদানী কিনে তাতে গোলাপ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। যেন ওই গোলাপের গন্ধে বাদশা এসে ওকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।

ফুলবানুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কোথায় ভেবেছিল সে দিদিদের এসে এই অদ্ভুত ফুলদানিটার গুণের কথা বলবে। তা নয়, এসেই বকা শুনতে হল। ফুলদানিটা নিয়ে একপাশে সরে গেল ফুলবানু।

আসলে ওটা ছিল যাদু-ফুলদানি। এক পরী ফুলবানুর মিষ্টি ব্যবহারে বুড়ি সেজে ওর কাছে ওটা বিক্রী করেছে। বিক্রীর সময় ফুলদানির গুণাগুণও পরীক্ষা করিয়ে দেখিয়েছিল ওকে। ফুলবানুও নাচতে নাচতে বাড়িতে ফিরেছিল দিদিদের দেখাবে বলে। কিন্তু দিদিরা তো দেখলই না, উল্টো ফুলবানুকে গালাগাল দিলে ফুলবানুর খুব অভিমান হল।

সে রাত্রে ওরা ফুলবানুকে নুন রুটি দিয়ে নিজেরা ভাল খেল। ফুলবানুর তাতে একটুও দুঃখ হল না। সে চাইছিল, কতক্ষণে

দিদিরা ঘুমিয়ে পড়বে। দিদিরা ঘুমোলেই সে ফুলদানির কাছে গিয়ে তারা যাদুর ব্যাপারটা একবার পরীক্ষা করবে।

একটু পরেই দিদিরা ঘুমিয়ে পড়ল। রাত নিঝুম। ফুলবানু

উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ফুলদানির সামনে দাঁড়াল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, দাও তো ফুলদানি। ভালো ভালো খাবার দাবার আর ভালো ভালো পোষাক-আশাক দাও না আনি। মনের সুখে একটু সময় খাই দাই আর নিজেকে সাজাই।

যেই না কথাগুলো বলেছে; সঙ্গে সঙ্গে অবাক কান্ড। ফুলদানির পাশেই রুপোর থালায় অনেক ভালো ভালো সুগন্ধী খাবার আর ঝলমলে মখমলের সব পোষাক এসে হাজির হল। সারারাত তাই খেয়ে আর গয়নাগাঁটি পরে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াল ফুলবানু। তবে ভোর হওয়ার আগেই আবার ফুলদানির কাছে এসে বলল, নাও তাই ফুলদানি—যা দিয়েছিলে তা ফিরিয়ে নাও। আবার চাইলেই যেন পাই।

সঙ্গে সঙ্গে অমনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেসব। দিদিরা টেরও পেল না এতটুকু। রোজ রাত্রে ফুলবানুরও চলল এমনি এক খেলা।

কয়েক মাস পরে একদিন শহরে হঠাৎ ঢেঁড়া পড়ল। ঢেঁড়ার বিষয়, সুলতানের বেটি শাহজাদীর বিয়ে হবে আর সেই দিনই শাহজাদার শাদীর জন্য মেয়ে পছন্দ করা হবে। রাজ্যের যত মেয়ে আছে তাদের সকলেরই রাজপ্রাসাদে নেমতন্ন।

নির্দিষ্ট দিনে বড় দিদিরা ফুলবানুকে বলল; তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই ঘরে থাক। আমরা বড়। আমরাই যাই।

ফুলবানুর দুঃখ হলেও মুখে কিছু বলল না।

দুই দিদি চলে গেল।

দিদিরা চলে যাওয়ার পরেই ফুলবানু ফুলদানির কাছে এল। ফুলদানিকে ডেকে বলল, ফুলদানি ভাই—ফুলদানি; আমায় তুই

সাজিয়ে দে তো দেখি। একবার যাই রাজপুরীতে। দেখি আমি শাহজাদাকে—

অমনি অপূর্ব কাণ্ড! দেখতে না দেখতেই এল পৃথিবীর সবচেয়ে দামী দামী শাড়ি। দামী গয়না-গাঁটি আর বহুমূল্যের অলংকার। সেসব পরেই মনের মত সাজল ফুলবানু। তারপর এগিয়ে চলল রাজপুরীর দিকে। তখন তাকে কেউ চিনতে পারে না। হাঁ করে শুধু তাকিয়েই থাকে।

রাজপুরীতে যেতেই সোরগোল পরে গেল। এ যে অপরূপ সুন্দরী এক রাণী। কোন দেশের শাহজাদী সে! অমন কি ফুলবানুর দুই দিদিও তাকে দেখে চিনতে না পেরে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—এ কোন দেশের শাহজাদী! এতো সুন্দর। না জানি এর সঙ্গেই বিয়ে হয় শাহজাদার। শাহজাদার পাশে একেই দারুণ মানাবে।

এক ফাকে খাওয়া-দাওয়া হল। খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হল নাচগান। তারই এক সুযোগে ফুলবানু সেই প্রাসাদ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল। কি জানি, যদি দিদিরা ফিরে যায়!

তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজের পোষাক-আশাকের দিকে নজর পড়তেই ফুলবানু দেখল তার পায়ের হীরের নূপুর কখন খুলে পড়ে গেছে। এই রে! এখন কি হবে? ফুলদানি যদি কিছু বলে?

দুরু দুরু বুকে ফুলদানির কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বলে সব কিছু ফেরৎ দিয়ে ছেঁড়া কাঁথায় মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল ফুলবানু।

তার দিদিরা ফুলবানুকে দেখে আর সন্দেহ করতে পারল না।

কিন্তু দিদিরা সন্দেহ না করলেও পরের দিন শাহজাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ সেই হীরের নূপুরটা কুড়িয়ে পেল। নূপুড়টা দেখেই তার মনে হল, কাল রাত্রে এসে হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া সেই শাহজাদীর কথা। এ নিশ্চয়ই তার নূপুর। নূপুরটা তুলে এনে সে ঘোষণা করল, এ নূপুর যার তাকেই সে বিয়ে করবে।

বাস! অমনি সঙ্গে সঙ্গে সুলতান চারদিকে অনুচর পাঠালেন। যেখানেই থাক, কাল রাতের সেই সুন্দরীকে খুঁজে নিয়ে আসতে।

কিন্তু অনেক খোঁজ করেও পেল না তারা।

তখন শাহজাদার মা, সুলতানের বেগম বললেন, ওভাবে নয়। এক কাজ কর। তোমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব মেয়েদের সসম্মানে দরবারে নিয়ে এসো।

অনুচররা আবার বেড়িয়ে পড়ল। এমনকি ফুলবানুদের বাড়িতে যেতেও ভুলল না। তার দুই দিদি নিজেরা ফুলবানুকে লুকিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। কিন্তু একজন অনুচর ফুলবানুকে দেখে ফেলায় তাকে নিয়ে চলল।

রাজপ্রাসাদে ফুলবানু যেতেই সবার সন্দেহ হল। বেগমের পরামর্শে তাকে বহুমূল্য পোষাক আর গয়নাগাটিতে সাজানো হল। তখন সবাই অবাক। এ তো কালকের সেই মেয়ে।

এরপর আর দেরী হল না। খুব ধুমধাম করে এরপর শাহজাদার সঙ্গে ফুলবানুর বিয়ে হয়ে গেল।

তার বিয়ের পরে দুই দিদি তো হিংসের জলে পুড়ে মরতে লাগল। ভাবল, কি করে ফুলবানুকে মারা যায়।

এদিকে ফুলবানুর মনে তো আর এসব ছিল না। সরল মনে একদিন রাজপ্রসাদে তার দুই দিদিকে আনিয়ে সেই ফুলদানির কথাটা বলে ফেলল। ওতেই হল তার কাল।

একদিন স্নান সেরে ফুলবানু যেই ঘরে ঢুকেছে, অমনি তার দুই দিদি তাকে নিয়ে বসল চুল বেঁধে দেওয়ার জন্য। সুন্দর করে খোপা বেঁধে তারা তাতে আটটি সোনার কাঁটা গুঁজে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলবানু একটা বুলবুলি পাখি হয়ে গেল। দিদিরা তখন তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল।

এদিকে সন্ধ্যেবেলায় ফুলবানুকে না দেখে শাহজাদার মন খারাপ হয়ে গেল। খুব ব্যস্ত হয়ে সে চারপাশে খুঁজল। কিন্তু ফুলবানু কোথাও নেই। না রাজপ্রাসাদে। না রাজধানীর ভেতরে। না রাজ্যের অন্য কোথাও?

দুই দিদি এবার যেন শ্বাস ফেলে বাঁচল। তাড়াতাড়ি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল তারা। যাওয়ার আগে অবশ্য যাদু ফুলদানীটা নিয়ে যেতে ভুলল না তারা।

এদিকে শাহজাদা রোজ মন খারাপ করে বসে থাকেন। একদিন এমনি বসে চুপচাপ ফুলবানুর কথা ভাবছিলেন, হঠাৎ দেখলেন

খুব সুন্দর একটা বুলবুলি পাখি। পাখিটাকে আগেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তবে এভাবে তাকাননি। পাখিটাকে দেখেই সেদিন শাহজাদার খুব ভাল লেগে গেল। সে হাত বাড়াল। পাখিটা অমনি তার হাতে এসে বসল। কোনো ভয়ডর নেই। শাহজাদা অবাক হল। পাখিটাকে রোজই কাছে নিয়ে আদর করতে লাগল।

একদিন আদর করতে করতে হঠাৎ শক্ত মত কি যেন ঠেকল পাখিটার মাথায়। অমনি মাথাটা দেখল শাহজাদা। নজরে পড়ল, আটটা সোনার কাঁটা পাখিটার মাথার ভেতরে ঢুকে আছে।

খুব কষ্ট হচ্ছে মনে করে সোনার কাঁটাগুলো টেনে টেনে খুলে ফেলল সে। ফেলতেই চমকে উঠল। এ যে ফুলবানু। সামনে দাঁড়িয়ে তার হাসছে। শাহজাদা এবার বুঝল, ওই কাঠিগুলো নিশ্চয়ই যাদুকাঠি।

ফুলবানুকে জিজ্ঞেস করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাস! মুহূর্তেই রাগে আগুন হয়ে উঠল শাহজাদা। সঙ্গে সঙ্গে অমনি তার দুই দিদিকে ধরে কঠিন শাস্তি দিলেন।

ফুলবানু অবশ্য সেই ফাঁকে তার যাদু ফুলদানিটা ফিরিয়ে আনতে ভুলল না। তারপর শাহজাদার সঙ্গে পরম সুখেই দিন কাটাতে লাগল। ফুলবানুর তখন যেন আনন্দ আর ধরে না।

সওদাগর, দৈত্য সম্রাট ও তিন শেখের গল্প

এক ছিল সওদাগর। প্রচুর ধনরত্নের মালিক। লোকে বলে, তার টাকা পয়সা নাকি কোনোদিন ফুরোয় না। এত টাকার মালিক সে। তবে এই ধনদৌলত কিন্তু একদিনে আসেনি। তার জন্য অনেক ঘুরতে হয়েছে। অনেক কষ্ট অনেক পরিশ্রম সহ্য করে অনেক রকম বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে; তবেই না এই ধনরত্নের মালিক হয়েছে।

একবার এমনি দূরদেশে গেছে সওদাগর। অনেক গ্রাম নগর ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক জায়গায় এসে গরমে ক্লান্ত হয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে একটু বিশ্রামের জন্য। আসলে দূর থেকেই সওদাগরের নজরে পড়েছিল, নদীর ধারে বিশাল একটা বটগাছ।

যেমন তার ডালপালা পাতাগুলোও তেমনি চারদিকে ঝাঁকড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে! ঐ গাছের নিচে ছায়ায় খানিকক্ষণ বসে নিশ্চয়ই বিশ্রাম করা যাবে। এই ভেবেই গাছের কাছাকাছি ঘোড়া চালিয়ে এসেছিল সওদাগর। এসেই যেমন ভাবা তেমনি ঘোড়া থেকে নেমে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে চিবিয়ে নিল সে। আরপর তার ঝোলা থেকে বার করল খাবার দাবার। একটা জলের বোতল।

রুটি-মাংস ও নানা সুস্বাদু তরকারী খেয়ে কিছু ফল বার করল সওদাগর। তারপর ফলগুলো খেয়ে তার আঁটিগুলো ছুঁড়ে মারল পর পর নদীর জলে। একটু পরে সেই বোতল থেকে জল খেয়ে একটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বোতলটা যেই না পাশে রাখতে গেছে অমনি সে ভয়ংকর চমকে উঠল। দেখল, তার সামনে এক দৈত্য দাঁড়িয়ে। ভয়ে সওদাগর তো সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করল।

দৈত্য ততক্ষনে রাগে দাঁত কিরমির করছে। সওদাগর তাকাতে সে বলল, নাও উঠে দাঁড়াও! এবার তোমাকে শেষ করে ফেলবো। এক কোপে মুণ্ডুটা কেটে ফেলবো।

ভয় পেলেও সওদাগর ততক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে খানিকটা। হাত জোর করে বিনীত হয়ে সে বলল, কেন আমি কি দোষ করেছি বলুন তো?

—কি দোষ করেছি! রাগে কাঁপতে কাঁপতে দৈত্য এবার বলল, আমার একমাত্র ছেলেকে মেরে ফেলে বলে আবার কি দোষ করেছি!

সওদাগর তো আকাশ থেকে পড়ল। বলল, সে কি! আবার

আপনার ছেলেকে মারলাম কখন ?

—কখন মেরেছেন ! তবে বলি শুনুন—দৈত্য বলতে লাগল; একটু আগে ফল খেয়ে আপনি যখন নদীর ভেতরে আঁটিগুলো ছুঁড়ে মারছিলেন ওই তারই একটা আঁটি এসে লাগে আমার ছেলের মাথায়। তাতেই ছেলেটা মরে গেল। এখন আমি আপনাকে ছাড়ছি না। নিন তৈরী হন—।

সব শুনে সওদাগর আর কি করে। বুঝল মরতে যখন হবেই তখন বাড়ির সবাইকে জানিয়ে; কিছু বাকি কাজকর্ম শেষ করে আসাই উচিত। তাই দৈত্যকে হাত জোড় করে বলল, দেখুন আমাকে আপনি ক্ষমা করুণ। আমি যা করেছি না জেনেই করেছি। জেনে শুনে আমি কখনো কারও ক্ষতি করিনা। আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্য যদি আমিই দায়ী হই তাহলে আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন। তবে এখনই নয়। তার আগে আমি একবার বাড়ি থেকে আসি। সবার সঙ্গে দেখা শোনা ও আমার অসমাপ্ত কিছু কাজ করে আসি। কথা দিচ্ছি তারপর আমি এখানে ঠিক আসবো। তখন আপনি আমাকে যা শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে নেবো।

কি ভেবে দৈত্য তাতেই রাজি হল।

বাড়ি গিয়ে সওদাগর বাকি কাজগুলো শেষ করে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রায় বছর খানেক বাদে আবার সেই নদীর ধারে বটগাছের তলায় হাজির হল। মন তার খুবই খারাপ। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল। জলে ঝাপসা হয়ে উঠছিল দুই চোখ। বুঝতে পারছিল আর একটু পরেই ঘনিয়ে আসবে মৃত্যু।

এ সবই যখন ভাবতে ভাবতে আসছিল ঠিক সে সময়ে বটগাছের কাছাকাছি চোখে পড়ল একটি মানুষকে। কম বয়েসী এক শেখ

একটা বুনো রামছাগলের গলায় দাঁড় দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। সওদাগরকে দেখে শেখ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তারপর; কি সওদাগর সাহেব আপনি এখানে এই দৈত্য-দানবের দেশে কেন ?
শেখের কথার উত্তরে সওদাগর জানাল তার দুঃখের কাহিনী। বলল; কেন সে এখানে এসেছে। সব শুনে সেই শেখ বলল, আপনার মতো মানুষ তো খুব কম দেখেছি। শুধু মাত্র একটা সত্য রক্ষার জন্য আপনি একবার জীবন পেয়েও আবার জীবন দিতে এলেন এখানে। যাই হোক আপনি সত্যবাদী, সত্যরক্ষার জন্য যেমন এখানে এসেছেন তেমনি আল্লাও আপনাকে রক্ষা করবেন।
বলতে বলতে কি আশ্চর্য আর একজন শেখ কোথা থেকে হঠাৎ হাজির হল। তার হাতে চমৎকার এক জোড়া কালো বড় কুকুর। সওদাগরের কথা শুনে সেও খুব সহানুভূতি জানাল। এবং সওদাগর একটু পরে আরও অবাক হয়ে গেল একটা খচ্চর নিয়ে আরও একজন শেখকে সেখানে আসতে দেখে। এই শেখও সওদাগরের কথা শুনে সমবেদনা জানাল।
একটু পরে একটা ভীষণ শব্দে বালির ঝড় উঠল। নদীর ধারের বালিগুলো হঠাৎ উঁচুতে উঠে গোলাকার একটা থাম হয়ে গেল। তারপরেই সেই থামটা বিকট এক দৈত্যে পরিণত হল। সওদাগরকে দেখে সেই দৈত্য একটা তলোয়ার নিয়ে এসে প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বলল, নাও এবার তৈরী হও। এবার আমি তোমার মুণ্ডু নেব। দেখেই সওদাগরের বুক কাঁপছিল ভয়ে। তার ওপর তলোয়ার হাতে দৈত্যকে হুংকার দিতে দেখে আর কথা সরল না মুখ থেকে।

সওদাগরের অবস্থা দেখে প্রথম শেখের খুব মায়া হল। দৈত্যের কাছে এগিয়ে সে তখন বলল, হে দৈত্য সম্রাট! তুমিই তো দৈত্য কুলের মধ্যমণি। আমার সঙ্গে এই যে রামছাগলটা দেখছো; এই ছাগলের একটা গল্প আছে। আমি তোমাকে সেই গল্পটা বলতে চাই। গল্প শুনে যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে তুমি সওদাগরের সব দোষ ক্ষমা করে দিও।

দৈত্য শুনে বলল, ঠিক আছে শুনবো তোমার গল্প। গল্প শুনে যদি ভাল লাগে তাহলে সওদাগরের অপরাধের তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষমা করে দেবো। নাও শুরু কর তোমার গল্প—

প্রথম শেখ তখন বলতে শুরু করল।

—শোনো দৈত্য সম্রাট আমার সঙ্গে এই যে রামছাগলটা দেখছো এটা কিন্তু আসলে রামছাগল নয়। এ হল আমার বিয়ে করা বিবি। আমার চাচার মেয়ে। ওর সঙ্গে আমি তিরিশ বছর ঘর করেছি। ছেলেবেলা থেকেই ও নানারকম জাদুবিদ্যা জানত। কিন্তু আমাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না বলে মনে ভীষণ দুঃখ ছিল।

কাজেই বিয়ের তিরিশ বছর পরেও যখন ছেলে মেয়ে হলনা; তখন আমি একজন দাসীকে বিয়ে করে আনলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই তার একটি সুন্দর ছেলে হল। দেখতে দেখতে সেই ছেলে আদর যত্ন পেয়ে বড় হতে লাগল।

ছেলের বয়স যখন পনের; সেই সময় আমাকে একবার কাজের জন্য বিদেশ যেতে হল। আমি বেরিয়ে যেতেই আমার বড়বিবি করল কি ছোটো বউ আর তার ছেলেকে একটা গরু আর একটা বানর বানিয়ে ছিল। ভীষণ হিংসে করতো সে। সেই হিংসে থেকেই ওদের এরকম করলো। এদিকে আমি বাড়ি ফিরে আসার পর বলল ছোটো বিবি হঠাৎ অসুখে ভুগে মারা গেছে। আর ছেলেটা গেছে পালিয়ে। শুনে আমার প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল। কেঁদে কেটে আমার দিন ফুরতে লাগল।

তারপর দেখতে দেখতে একদিন বকরি ঈদের পরব এল। গরু জবাই হবে। কিন্তু চাকরকে বলাতে আমার চাকর যে গরুটা আনল দেখি তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। দেখে আমার আর কাটতে ইচ্ছে করল না তাকে। চাকরটার হাতে ছুরি দিয়ে গরুটাকে পাঠিয়ে দিলাম। সেই তাকে জবাই করল। অমনি চমকে উঠলাম একটা খবর শুনে—এটা সত্যি কোনো গরু নয়। কাটার পর চাকর খবর দিল। গিয়ে দেখি ছোটবিবি মরে পড়ে আছে। আশ্চর্য! আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সে অবস্থায় চাকরটাকে ডেকে বললাম; যা ভাল দেখে একটা বাছুর নিয়ে আয়।

চাকর ছুটে গিয়ে একটা বাছুর নিয়ে এল। কিন্তু এবার আরও অবাক কাণ্ড! বাছুরটা ছুটে এসে আমার পায়ে-পড়ে কাঁদতে

লাগল। বড় মায়ায় পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাকরটাকে বললাম, যা এটাকে রেখে আর একটা নিয়ে আয়।
বোধহয় ব্যাপারটা প্রথম থেকে লক্ষ্য করছিল বড়বিবি। সেই এবার বলল, কেন আর একটা কেন? এটাই জবাই করনা। এটা তো বেশ ভালো।
কিন্তু বড়বিবি বললেও আমি তার কথা শুনলাম না। পরেরদিন চাকরটা এল ছুটতে ছুটতে। আমাকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে যে কথা বলল তাতে চমকে গেলাম আমি। সে জানাল, মালিক বড় তাজ্জব ব্যাপার। কাল এই বাছুরটাকে বাড়ি নিয়ে যেতেই আমার মেয়ে তাকে দেখে হঠাৎ অদ্ভুত হাসল। তারপর বলল, এ তো সত্যি বাছুর নয়। এই বাছুটা আসলে একটা মানুষের ছেলে। আমার মেয়ে যাদু জানে। সেই বিদ্যার ফলেই সে এটা জানতে পেয়েছে। মেয়ে জানাতেই আমি বললাম, এ সব কি বলছিস তুই? মেয়ে জানাল, হ্যাঁ বাবা এ হল তোমার মালিকের ছেলে। আর সকালে যে বড় গরুটাকে জবাই করেছো তোমারা সে হল এর মা। তোমার মালিকের ছোটো বিবি। মালিকের বড়বিবি এসব কাণ্ড করেছে তোমার মালিকের অনুপস্থিতিতে।
সব শুনে আমার চাকরের বাড়িতে ছুটে গেলাম আমি। তার মেয়েকে বললাম, আমার ছেলেকে যদি মানুষ করে দিতে পারো আগের মতো তাহলে আমি তোমাকে অনেক জিনিস দেবো। তুমি যা চাও তাই দেবো। তোমার বাবা আমার যে সব গরু-মোষের দেখাশোনা করে সেসব দেবো। দেবো গোলা ভরা শস্য। তুমি আমার ছেলেকে মানুষ করে দাও—
শুনে মেয়েটি বলল, আপনার ছেলেকে আগের মতো মানুষ করে

ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে।

—কি সেই শর্ত? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়ে উত্তর দিল, প্রথমত আপনার ছেলে মানুষ হলে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে। আর আপনার ওই বড় বিবিকে আমি ইচ্ছে মতো একটা জানোয়ার বানিয়ে দেবো। কি রাজি বলুন? বুঝতেই পারছেন সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হয়ে গেলাম। মেয়েটি তখন একটা তামার পাত্রে একপাত্র জল নিয়ে কি একটা মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে সেই মন্ত্র পড়া জল বাছুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিল। অমনি কি আশ্চর্য! মুহূর্তেই বাছুরটি আমার সেই ছেলের রূপ নিয়ে ফিরে এল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। সে বলল, আমি বাইরে যাওয়ার পর বড়বিবি তাদের এই দশা করেছিল।

বলাবাহুল্য এরপরেই আমি আমার ছেলের সঙ্গে ওই মেয়েটির ধুম ধাম করে বিয়ে দিলাম। মেয়েটি ইতিমধ্যে আমার বড়বিবিকে একটা বুনো রামছাগল বানিয়ে দিয়েছিল। ছেলের বিয়ের পর তাদের হাতে সংসারের দায় দায়িত্ব তুলে দিয়ে এরপর আমি এই রামছাগলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে লাগলাম দেশে দেশে শত হোক আমার বিয়ে করা বিবি তো! তাকে ফেলি কি করে! ....এই হল আমার গল্প। গল্পটা নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে আপনার!

গল্প শুনে দৈত্য খুব তারিফ করলো প্রথম শেখকে। তারপর

বলল, হ্যাঁ আমার খুব ভাল লেগেছে গল্পটা। সওদাগরের তিন ভাগের একভাগ অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম।
প্রথম শেখের গল্প শেষ হতে এবার দ্বিতীয় শেখ সেই চমৎকার কালো এক জোড়া কুকুর নিয়ে সামনে এগিয়ে এল। বলল, হে দৈত্য সম্রাট প্রথম শেখের ওই রামছাগলটার মতো আমার কুকুর জোড়ারও সুন্দর এক কাহিনী আছে। নিশ্চয়ই আপনি তা শুনবেন। আর শুনে ভাল লাগলে নিশ্চয়ই সওদাগরের বাকি আর একভাগ অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।
—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! দৈত্য বলে উঠল, আপনি বলুন। শুরু করুণ আপনার ওই কালোকুকুরের কাহিনী। কিন্তু মনে রাখবেন গল্পটা ভালো হওয়া চাই।

দ্বিতীয় শেখ তখন বলতে শুরু করল—
—হে দৈত্য সম্রাট আমার সঙ্গে এই যে কুকুর দুটো দেখছেন এরা আর কেউ নয়! আমার আপন দাদা। মন্ত্র বলে এরা কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে আমরা ছিলাম তিন ভাই। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমাদের তিন হাজার মোহর তিনজনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর

আমরা তিনজনই সেই মোহর নিয়ে যে যার আলাদা আলাদা দোকান দিয়ে ব্যবসায় মন দিলাম।

দিন যায়। আমাদের ব্যবসায় ভালই লাভ হতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরে বড় ভাই হঠাৎ দোকান উঠিয়ে দিয়ে একদল সওদাগরের সঙ্গে বিদেশে চলে গেল। যাওয়ার আগে তাকে অনেক বারণ করলাম। কিন্তু সে শুনল না। বছর খানেক বাদে ফিরে এল সর্বস্ব খুইয়ে!

তাকে বললাম, এত বার করে বললাম। শুনলে না তো? দেখ তাই আল্লা তোমাকে উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন। যাইহোক যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তোমাকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি তুমি আবার ব্যবসায়ে মন দাও।

বলে আমার ব্যবসা থেকে লাভের একটা অংশ তাকে দিয়ে দিলাম। বড়দা সেই টাকা দিয়ে আবার দোকান খুলে বসল বাজারে। কিন্তু বসলে হবে কি! থেকে থেকেই তারমনটা বাইরে যাওয়ার জন্য আনচান করে ওঠে। একদিন আমাকে এসেও সরাসরি জানাল, কিছু টাকা নিয়ে বাইরে গিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ার জনা। ইতিমধ্যে মেজ ভাইকেও সে হাত করে নিয়েছে। সেও এসে বড়দার হয়ে আমার কাছে দরবার করে জানাল, সবাই মিলে গেলে ভালই হবে ব্যবসাটা। কিন্তু শোনামাত্র আমি তাদের ভীষণ ধমক দিলাম। প্রচণ্ড রাগ করে বললাম, ভবিষ্যতে যেন তারা এমন প্রস্তাব আর না করে আমার কাছে।

একটু ভয় পেয়ে বড়ভাই আর মেজ ভাই চলে গেল। কিছুদিন বাদে আবার সেই বায়না। আরপর থেকে প্রায়ই প্রস্তাবটা করতে লাগল। আর যতবার করে ততবারই ওদের ফিরিয়ে দিতে

লাগলাম। এভাবে প্রায় ছটা বছর কেটে গেল। বারবার বলতে শেষ পর্যন্ত আমরাও জানি কেমন হয়ে গেল। একদিন আমিও বাইরে যেতে রাজী হয়ে গেলাম।
বড় আর মেজভাইকে ডেকে বললাম, তাদের যা লাভের অংশ হয়েছে তা নিয়ে আসতে। ওরা সেগুলো নিয়ে এলে সবার লাভের অংশ মিলিয়ে দেখলাম, মোট ছয় হাজার দিনার হয়েছে। তখন তার থেকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে রেখে বাকি অর্ধেক টাকার জিনিসপত্র কিনে নিলাম। মাটিতে পুঁতে রাখলাম এই কারণে যদি একবার বাণিজ্য করতে গিয়ে ভরাডুবি হয় তাহলে ফিরে এসেও যাতে দোকান সাজিয়ে আবার বসতে পারি। আমার বড় ভাই আর মেজো ভাই তাদের দোকান তুলে দিল। কিন্তু আমি তুললাম না। যেমন ছিল তেমনিই রেখে দোকান বন্ধ করে একদিন জাহাজ সাজিয়ে আমরা ভেসে পড়লাম।

দেখতে দেখতে কতদিন গেল। কত দেশ কত নগর কত বন্দর ঘুরে পছন্দ মতো নানা জিনিস কিনে নানান জিনিস বেচে প্রচুর লাভ করে আমরা একদিন সকালের দিকে নতুন এক দেশে এসে

হাজির হলাম।

জাহাজ থেকে নেমে একটু এদিকে ওদিকে ঘুরছি এমন সময় খুব সুন্দরী একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জানাল; সে খুব গরীব। খেতে পায় না ঠিক মতো। সেজন্য কাজ খুঁজছে একটা। এখন আমি যদি তাকে একটা কাজ দিই তবে খুব ভাল হয়। সে বেঁচে থাকতে পারে।

মেয়েটির ব্যবহারে এবং কথা শুনে আমার কেমন মায়া পড়ে গেল। আমি ওকে বিয়ে করে জাহাজে নিয়ে এলাম ; কিন্তু সেখানেই হল গণ্ডোগোল। আমাকে বিয়ে করতে দেখে আমার দু ভাই হিংসেই জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। আরা ভাবল, এবার আমি কখনও মরে গেলে আমার সম্পত্তি ভোগ করবে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা। তাছাড়া বয়সেও তারা বুড়ো। সেকারণে বিয়েও করতে পারেনি তারা। তাই মনে মনে আমার ওপর জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল।

একদিন রাত্রে আমি আর আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় ঝপাং করে একটা শব্দ হওয়ায় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভাঙতেই দেখি আমরা দুজনেই জলের ওপরে ভাসছি। আমি তো হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। হঠাৎ হল কি আমার স্ত্রী আচমকা এক বিশাল জিনির রূপ ধরে সেই জল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে নির্জন এক দ্বীপে শুইয়ে দিল। ঘন অন্ধকারে সেই দ্বীপের কোথায় কি আছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি। তবে এটা বুঝেছিলাম যে আমার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে। আর আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই যাদু জানে। তাই আমাকে এমন ভাবে উদ্ধার করতে পারল সে।

কিন্তু আমাকে বসিয়ে রেখে গেল ! আমার স্ত্রীর জন্য আমার

দুশ্চিন্তা হতে লাগল। সে রাতটা কোনো রকমে দুশ্চিন্তা নিয়েই কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন সকাল হতেই দেখি আমায় স্ত্রী এসে হাজির। জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, আসলে সে জিনের পরিবারের এক জিনি। জিনি-আহু। কিন্তু আমরা ভীষণ আল্লার ভক্ত। তাই তার নাম নিয়ে সব কাজ করে থাকি। কি হল অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো!

আমি তখুনি হেসে বললাম, না একটু অবাক হয়েছিলাম। তাছাড়া সারারাত চিন্তাও হয়েছিল। তা যাক তুমি যখন এসেছো নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা কোথায় এখন?

ওই তাদের জন্যই তো তোমার এই অবস্থা আজ। তোমার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে করে তোমাকে মেরে ফেলার জন্য সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছিল আমাদের। যাই হোক তুমি খুব ভাল মানুষ আর দয়ালু বলে আল্লা আমাকে দিয়ে তোমাকে বাঁচালেন। কিন্তু তোমার ভাইয়েদের কিন্তু এরপর আর বাঁচার অধিকার নেই। তাদের আমি উচিত শাস্তি দিচ্ছি।

বলে আমাকে কাঁধে করে আমার স্ত্রী আবার জিনির রূপ ধারন করে মুহূর্তেই আমাকে পেঁছে দিল আমার বাড়ি।

বাড়ি ফিরে মাটিতে পুঁতে রেখে আসা সেই তিন হাজার দিনার তুলে নিয়ে আমি আবার আমার দোকানে গেলাম। গিয়ে দেখি দোকান যেমন রেখে এসেছিলাম তেমনিই আছে। কোথাও কিছু হয়নি। সব কিছু গুছিয়ে-টুছিয়ে আবার ব্যবসায়ে মন দিলাম। আমার ভাইদের আর সেই জাহাজের তখনও কোনো খোঁজ খবর নেই।

একদিন দোকান থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি ঘরের দরজায় দুটো

কালো কুকুর। আমার স্ত্রী বলল, এই যে তোমার সেই গুণধর দুই ভাই। এদের কুকুর করে রেখেছি। কিন্তু প্রাণে মারিনি তোমার কষ্ট হবে বলে। কুকুর করে রেখেছে অবশ্য আমার এক বোন। সে ভাল জাদুবিদ্যা জানে। তাকেই বলেছি এদের কুকুর করে দিতে। সে আমার মতো তাই করে দিয়েছি। দশ বছর পর্যন্ত এদের এই অবস্থা থাকবে। তার আগে পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারবে না ওদের মানুষ রূপে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। দশ বছর শেষ হলে তবেই এরা আবার মানুষ রূপ ফিরে পাবে। কিন্তু তাও আমার বোন ছাড়া কেউই ওদের মানুষ করে দিতে পারবে না।

শুনে আমার চোখে জল এল। কিন্তু তবুও উপায় নেই। পাপের ফল ভোগ করতেই হবে ওদের। সেই থেকে ওরা এমনি কুকুর হয়ে আছে দৈত্য সম্রাট। গতকাল দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আজ তাই আমি ওদের নিয়ে বেরিয়েছি। যদি আমার শ্যালিকার দেখা পাই তাহলে এদের আবার মানুষ করিয়ে নেবো। তাছাড়া দশ বছরে নিশ্চয়ই এরা অনুতপ্ত হয়েছে নিজেদের পাপ কাজের জন্য। এই আমার গল্প দৈত্য সম্রাট। এখন বলুন এই গল্প আপনার ভাল লাগল কি না ?

দৈত্য বলল; হ্যাঁ হ্যাঁ দারুণ। খুব ভাল লেগেছে আপনার এই কুকুর দুটোর কাহিণী। মহাশয় আপনার এই গল্পের জন্য সওদাগরের আরও এক ভাগ অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম।

দৈত্য তারপর তৃতীয় শেখের দিকে তাকিয়ে বলল; মনে হচ্ছে আপনার ওই খচ্চরেরও কোনো গল্প আছে। দয়া করে তাহলে সেই গল্প বলুন।

—হ্যাঁ তা আছে। তৃতীয় শেখ বলল, তবে এই খচ্চরের গল্প বললে আপনি নিশ্চয়ই সওদাগরের বাকি অপরাধটুকুও ক্ষমা করে দেবেন। যদি কথা দেন দেবেন, তাহলে বলতে পারি।
দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই দেবো। তবে গল্পটা ভাল হওয়া চাই।
—তা তো নিশ্চয়ই। আপনি শুনেই দেখুন না কেমন জমজমাট গল্প। বলতে বলতে তৃতীয় শেখ শুরু করল তার কাহিণী। আসলে এই খচ্চরটা আমার বিবি দৈত্য-সম্রাট। জাদু বলে সে খচ্চর হয়ে গেছে। একবার আমি বিদেশে গেছি কি কাজে।

ফিরতে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেল। পথে ঘাটের ব্যাপার। কত রকম কি ঘটতে পারে! না কি বলুন দৈত্য সম্রাট। কাজেই বাড়ি যখন ফিরে এলাম তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন—কোথায় আমার দেরী দেখে আমাকে কি হয়েছে, কেন দেরী হয়েছে জিজ্ঞেস করবে তা নয় বিবি ভয়ংকর রেগে উঠল আমার ওপর। রাগ দেখে আমি দাঁড়াতেই পারলাম না তার সামনে। তবু হয়তো তাকে সব ঘটনা বুঝিয়েই বলতাম। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল।

বিবি হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা তামার পাত্র নিয়ে এল। তারপর তার ভেতর থেকে একটু জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতেই দেখি আমি কুকুর হয়ে গেছি। বিবি আমাকে সেই অবস্থায়ই দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল। অগত্যা আর কি করবো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরলাম। কিন্তু কোথায় যাবো কি করবো কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে একসময় হাঁটতে হাঁটতে এ-দোকান সে-দোকান হয়ে এক কসাইয়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। ভেবেছিলাম অন্যান্যদের মতো কসাই ও আমাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেই মানুষটি ছিল খুব দয়ালু ও ভালো। আমাকে ভেতর নিয়ে নানা জিনিস খেতে দিয়ে একটা জায়গায় থাকতে দিল। ভালো খাবার ও আশ্রয় পেয়ে আমি সারাদিন সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। রাতের দিকে দোকান বন্ধ হলে আমি কসাইয়ের দিকে তাকালাম। কসাই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কসাইয়ের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু বাড়িতে উঠতেই আমাকে দেখে কসাইয়ের মেয়ে এগিয়ে এল। প্রথমে একটু লজ্জা পেলেও সে তার বাবাকে ডেকে নিয়ে আমার কথা। বলল, বাবা এই কুকুরটি আসলে কুকুর নয়। এ মানুষ। আমি দেখেই ঠিক বুঝতে পেরেছি। বলতে বলতে কসাইয়ের মেয়ে ঘরে ঢুকে একপাত্র মন্ত্রপূত জল নিয়ে এসে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মানুষ হয়ে গেলাম। কসাই ততক্ষণে প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। এবং একটু পরে আমার সব কথা শুনে তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিল। বিয়ের পর মেয়েটি বলল, আপনার আরও ক্ষতি করতে পারে।

কাজেই তাকেও এবার শাস্তি দেওয়া উচিত।
বলে সেই দিনই বাড়িতে গিয়ে সে আমার পুরনো বিবির গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেই সে একটা খচ্চর হয়ে গেল। হে দৈত্য সম্রাট সেই থেকে আমি এই খচ্চরটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

গল্প শুনে দৈত্য সম্রাট প্রচণ্ড খুশি। সে এবার বলল, বাহ: আপনাদের সব গল্প শুনেই আমি খুব খুশি হয়েছি। বিশেষ করে এই গল্পটা শুনে। কাজেই সওদাগরের সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম। আপনারা এবার যে যার নিজেদের পথে যেতে পারেন। আমি আশীর্বাদ করছি আপনাদের ভাল হোক। আপনার জীবন সুখের হোক। বলতে বলতে দৈত্য-সম্রাট যেমন এসেছিল তেমনি আবার মিলিয়ে গেল।

খুশরু ও লুৎফার কাহিনী

নামকরা এক ধনী বণিক।—বাহার। বিয়ের এক বছর পরেই তার সুন্দর একটি ছেলে হল। ছেলে তো নয় যেন বেহস্তের একটি ফুল। ফুলের মতো সুন্দর হাসি দেখে বাপ তার নাম রাখলেন খুশরু।

ছেলে হওয়ার দিন সাতেক বাদে বণিক ভাবলেন; স্ত্রী বেচারির খুব পরিশ্রম হবে এবার। একে সংসারের নানান কাজ তার ওপর ছেলের দেখা শোনা করা। কাজেই বাজার থেকে একজন বাঁদী আনা দরকার। বাঁদী এলে তবু স্ত্রীর খানিকটা পরিশ্রম কমবে। ভেবে একদিন বাজারে গেলেন বণিক। ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁছলেন বান্দা-বাদীর জায়গায়।

বাজারে অনেক বান্দা-বাঁদীই আনা হয়েছিল সেদিন। ঘুরে দেখতে দেখতে খুব সুন্দর এক বাঁদীকে পছন্দ হল বণিকের। বাঁদী যে নিজেই শুধু দেখতে সুন্দর তাই নয়। তার পিঠে বাঁধা ঝোলাতে ছিল সদ্যজাত দিন কয়েকের একটি মেয়ে। ঠিক যেন একটি জুঁই ফুল। যেমন গায়ের রঙ তেমনই দেখতে। আকাশের চাঁদও বুঝি তার রূপের কাছে হার মানে। বেহস্তের হুরীরাও সে মেয়ের রূপ দেখে লজ্জায় মুখ লুকোয়।

বণিক মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করে একজন দালালের কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন; হ্যাঁ ভাই একসঙ্গে ওই বাঁদী আর মেয়েকে কিনতে কত লাগবে বলতে পারো?

দালাল উত্তর দিল; পঞ্চাশ দিনার পড়বে জনাব। এর এক দিনারও কম-বেশি নয়।

বণিক তাতেই রাজি হয়ে গেল। থলে থেকে পঞ্চাশ দিনার দিয়ে চুক্তিনামায় সই করে বাচ্চাসহ ওই বাঁদীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। বণিকের স্ত্রী তো বাচ্চাসহ ওই বাঁদীকে দেখেই বণিককে বলল; এ কী করেছো তুমি। কি দরকার ছিল হঠাৎ এমন খরচ বাড়িয়ে। তাও এনেছো এনেছো আবার সঙ্গে একটা বাচ্চা।

—আহা—বণিক বলল; ওই জন্যেই তো এনেছি। এই ছোট্ট মেয়েটি যখন বড় হলে আমাদের ছেলের সঙ্গে ওকে মানাবে বেশ ভাল। না কি বল!

বণিকের স্ত্রী স্বামীর কথায় আর কোনো উচ্চবাক্য করলো না। একটু পরে বাঁদীটিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি গো বাছা। বাঁদী ধীরে স্নেহে উত্তর দিল; সাদৎ।

—সাদৎ! বাহ্ বাহ্ বেশ নাম। আর তোমার ওই মেয়ের নাম!

ওর নাম কি রেখেছো ?

বাঁদী চোখ নামিয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞে কিসমৎ।

—বাহ্ বাহ্ ! বণিক এবং বণিকের স্ত্রী দুজনেই নাম শুনে খুব খুশি। বণিক বললেন, দেখ নামদুটো তো বেশ ভালই। তবে কিনে আনার পরে প্রত্যেক বাঁদীরই তো নাম দেওয়া হয় নতুন করে। আমাদের এই বাঁদীরও তাই নতুন একটা নাম দেওয়া দরকার। আর হ্যাঁ বাচ্চা মেয়েটারও একটা নাম রাখা দরকার। আচ্ছা কি নাম দেওয়া যায় বল তো বাচ্চাটার ?

বণিকের স্ত্রী উত্তর দিল, তুমিই বল না ?

—না তুমিই বল। বণিক বলতেই বণিকের স্ত্রী একটু ভেবে বলল, তাহলে ওর নাম থাক লুৎফা। কি ঠিক হল তো?

—বহুৎ ঠিক। লুৎফা খুব চমৎকার নাম। খুশরুর পাশে খুব মানাবে।

বলতে বলতে বাচ্চাসহ বাঁদীটিকে নিয়ে বণিক আর বণিকের স্ত্রী ভেতরে চলে গেল।

দিন যায়। খুশরু আর লুৎফার দিন কাটে আনন্দে। খুশির জোয়ারে ভেসে চলে দুজনেই। একসঙ্গে একই ভাবে মানুষ হতে

থাকে দুজনে। এক সঙ্গে খায়-দায়। ঘুমোয়। খেলে। খুশরু জানে লুৎফা তার বোন। লুৎফা জানে খুশরু তার দাদা। কিন্তু এভাবেই মানুষ হতে হতে দুজনেই তখন তেরোতে পা দিল, বণিক তখন ছেলের কাছে ওদের দুজনের সম্বন্ধের ব্যাপারটা আর লুকিয়ে রাখা ঠিক মনে করলেন না। একদিন ছেলেকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন; দেখ বেটা তোকে একটা কথা বলি। আমার মনে হয় এখুনি সেটা বলার সময় হয়েছে।

ছেলে অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাতেই বণিক বললেন; কথাটা হচ্ছে লুৎফাকে নিয়ে। বেটা লুৎফা কিন্তু তোর বোন নয়। আমাদের বাড়িতে ওই যে বাঁদীকে দেখিস—লুৎফা তারই মেয়ে। ওদের দুজনকেই একদিন আমি কিনে এনেছিলাম।

—তাই নাকি! ছেলে তো চমকে ওঠে আর কি! জিজ্ঞেস করল; লুৎফা তাহলে আমার বোন নয়।

—না বেটা। তাই তো জানাবার জন্যই তোকে আজ কথাটা বললাম। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। ভাবছিলাম লুৎফা তো বড় হয়েছে। ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার আমাদের। ওর সাদীর ব্যবস্থা করছি আমি। বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন ও ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবে। তুই আর আগের মতো ওর সঙ্গে মিশবি না। সেটা ঠিক হবে না।

শুনে খুশরুর মন খারাপ হয়ে গেল। বোন নয় জেনে যতটা না, তার চেয়ে বেশি হল লুৎফার সঙ্গে আর মিশতে পারবে না জেনে। একটু পরে কি ভেবে বলল, বাপজান ওর যদি সাদির কথাই ভেবে থাকো তাহলে একটা কথা বলি। বলছিলাম তাহলে আর লুৎফাকে বাইরে সাদি দিয়ে লাভ কি! ওকে আমারই বিবি কর না কেন?

তাহলে তো ও আমাদের বাড়িতেই থেকে যেতে পারে।

—হ্যাঁ তা পারে। তবে কি জানিস বেটা এ-ব্যাপারে আমিই তো সব নই। তোর মায়ের মতটাও একবার নেওয়া দরকার।

বাপের কথা শোনা মাত্রই খুশরু ছুটল মায়ের কাছে। মা শুনে বলল, পাগল ছেলে ওকে তো তোর বিবি করার জন্যই আনা হয়েছে।

খুশরু শুনে আর দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল লুৎফার কাছে। খবরটা জানাবে বলে। বলাবাহুল্য শুনে লুৎফারও আনন্দ আর ধরে না। কেননা এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কারও বাড়িতে চলে যাবে এটা শুনেই প্রথমে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুশরুর কাছে সবটা শুনে মুহূর্তেই আবার হাসি ফুটে উঠেছিল মুখে। এরপর শুভ দিন দেখে খুশরুর সঙ্গে খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল লুৎফার। বিয়ের পর পাঁচ পাঁচটা বছর বেশ সুখেই কাটল। ইতিমধ্যে বণিক বাহারের পুত্র বধূর প্রশংসা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই বলাবলি করত লুৎফার মতো এমন বিদুষী তার অনুগত মেয়ে পাওয়া যায় কি না। খুঁজলে বেহেস্তেও বোধহয় এমন মেয়ে পাওয়া যাবে না। কথাটা অবশ্য একটুও বাড়াবাড়ি নয়। লুৎফা তার অবসর সময়ে কোরান পড়ত। কাব্য সাহিত্য দর্শন পড়ত। আর চর্চা করত গান বাজনার। কত রকম রাগ রাগিনী যে সে জানত তার শেষ নেই। কাজেই এমন মেয়ের গুণের কথা ছড়িয়ে তো পড়বেই। তার ওপর আবার সে সুন্দরী ধনী বণিক বাহারের পুত্র বধূ।

বেশ সুখেই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু খোদা বুঝি কারো কপালেই একনাগাড়ে সুখ লেখেন না।

লুৎফার রূপ গুণের সারা শহরে এভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিস যে সেই শহরের দুষ্টমতি ওয়ালির (শাসন কর্তা) কানে যেতেও তার দেরী হল না। কিন্তু ওয়ালির কানে যেতেই সে ভাবল,
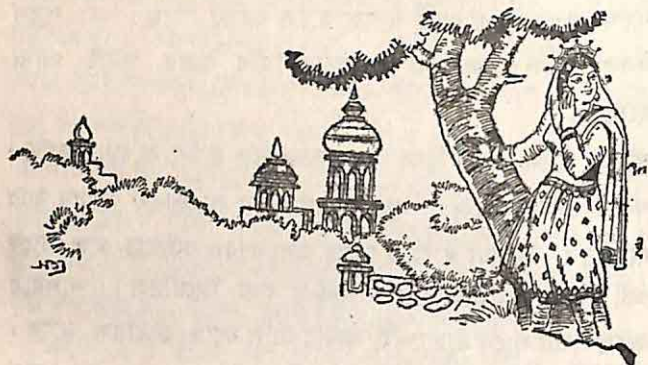
যেমন করেই হোক ওই লুৎফাকে আমার চাই। তাহলে তাকে বাঁদী বলে খলিফা আবদল মালিক ইবন মারবনকে উপহার পাঠাতে পারলে তার সুনজরে পড়ে যাবো আমি।
বেশ কয়েকদিন এই কথাটা ভেবে শেষে একদিন এসব কাজে পাকা ঘুঘু এক বুড়িকে ডেকে পাঠালো ওয়ালি। বলল, শোন চাচী তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। ঠিক মতো করতে পারলে প্রচুর ইনাম মিলবে।
বুড়ি হাসল। বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু কাজটা কি! সেটা খুলে না বললে!
—বলছি বলছি। না বললে আর তোমাকে ডেকে এনেছি কেন? শোন—বণিক বাহারের পুত্রবধূ লুৎফার কথা তো শুনেছো নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা আর শুনবো না। বুড়ি শুকনো গালে হাসে। বলে, তার কথা কে না শুনেছে।
—ঠিক আছে। তাহলে বলি শোন ওই লুৎফাকে যেভাবে পারো চুরি করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি ওকে খলিফার কাছে ভেট পাঠাবো।
শুনে মনে মনে চমকে উঠলেও বুড়ি বলল; এ আর এমন কাজ কি! আমি নিশ্চয়ই ওকে আপনার কাছে এনে দোব।
ওয়ালি খুশি হয়ে বুড়িকে বলল; তাহলে এখনই তুমি বেরিয়ে পড়। আর এই নাও—কিছু মোহর সঙ্গে নিয়ে যাও।
মোহরের থলিটা নিয়ে বুড়ি বেড়িয়ে পড়ল। বাড়িতে ফিরে এসে সবকিছু ভেবে নিল। কিভাবে সে বণিক বাহারের বাড়িতে যাবে বলবে সবাইকে।
পরের দিন সকালে মোটা একটা পশমের আলখাল্লা পড়ে গলায় বড় তসবীর মালা ঝুলিয়ে ফকিরণীর সাজে লাঠি হাতে ঠক ঠক করতে করতে বুড়ি বেরিয়ে পড়ল। মুখে ঘনঘন বলতে লাগল-- আল্লাহম দুলিল্লা—। লয়লাহাইলিল্লা। তার মুখে এসব শুনে রাস্তার লোকজন তাকে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী ভেবে তার কাছে ভিড় করতে লাগল। তার কাছে দোয়া মাঙতে লাগল। আর এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন এসে পেঁছোল বণিক বাহারের বাড়ির দরজায়।
বাহারের বাড়ির সিংহ দরজা পাহাড়া দিত এক বিচক্ষণ বুড়ো দরোয়ান। বুড়িকে দেখেই তার কেমন সন্দেহ হল। মনে হল— বুড়ির ভাবভঙ্গী ঠিক সন্ন্যাসিনীর মতো নয়। তাই বুড়ি এসে বাহারের দরজায় দাঁড়াতেই সেই দারোয়ান এগিয়ে এল।

বুড়ি ততক্ষণে সাড়া তুলেছে, কে আছো গো—ফকিরণী এসেছে —একবার ভেতরে যেতে বলো।

দরোয়ান বলল; কেন ভেতরে তোমার কি দরকার চাচী।

—দরকার! বুড়ি ফকিরণী আমি। আমার আবার কি দরকার। দরকার আমার নামাজের। সময় হয়ে এসেছে যদি এখানেই নামাজটা সেরে ফেলতে পারি তবে ভালো হয়।

—তা ভালো হয়। তবে—দরোয়ান বলল; এটা তো গৃহস্থের বাড়ি। মসজিদ নয়। কোনো মসজিদ দেখে সেখানেই গিয়ে নামাজটা পড়ে নাও। এটা বণিক বাহার সাহেবের বাড়ি। তাও জানো না।

বুড়ি তাকায়। বলে, জানি জানি। জানি বলেই তো এখানে ঢুকে নামাজ পড়ার কথাটা বলছি। বণিক বাহার সাহেবের বাড়ি মসজিদের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। এ কথা তোমার জানা না থাকলেও আমার জানা আছে হে মূর্খ। তুমি জানো আমি কে! দামাস্কাসের খলিফার সঙ্গে আমার ওঠা-বসা। তিনি আমাকে খুব খাতির করেন। সেই সুদূর দামাস্কাস থেকে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে এখানে এসেছি আমি। এসে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে তাদের মঙ্গলের জন্য নামাজ পড়ছি।

—তা হোক্। তুমি সরে পড়। এ বাড়িতে তুমি না-ই বা নামাজ পড়লে। এ বাড়ির মঙ্গলের কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

বুড়ি দেখে; বেজায় বিপদ। দরোয়ান তার মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু বুঝলেও তাকে বুঝতে দেবে না সে। যেভাবেই হোক বাড়ির ভেতরে ঢুকবেই। লুৎফার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলেই হল। তারপর কি করবে তা তার জানা আছে।

ভেবে বুড়ি বাড়িতে ঢোকা নিয়ে বেশ জোর গলায় দরোয়ানের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল।

এদিকে হয়েছে কি—বাইরের দিকে জোর গলায় কথা কাটাকাটি শুনে খুশরু বেরিয়ে এসেছিল। বুড়িকে দেখে সব শুনে সে দরোয়ানকে বলল, বুড়িকে ভেতরে আসতে দিতে।

বুড়ি এবার কটমট করে দরোয়ানের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে খুশরুর পেছনে পেছনে চলল। এ ঘর সে ঘর পার হয়ে খুশরু তাকে নিয়ে পেঁছে দিল লুৎফার কাছে। জানাল, দেখ কে এসেছে। তুমি ওর এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল।

লুৎফাকে দেখে বুড়ির ততক্ষণে চোখ ছানাবড়া। এত সুন্দর ও মানুষ হয়। কি রঙ কি মুখের গড়ন। বুড়ি বুঝল, কেন ওয়ালি একে ভেট পাঠাতে চায় খালিফার কাছে। কিন্তু মুখে বা হাবভাবে তা এখন কোনো মতেই যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য বুড়ি এসব চিন্তা এখন মন থেকে মুছে ফেলল সে। ভাবল কি করে এখন লুৎফাকে হাত করা যায়।

লুৎফা ফকিরণী বেশী বুড়িকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে সেলাম করে ততক্ষণে বলে উঠেছে, আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন এ

আমাদের পুণ্য। আমাদের মঙ্গল হবে এতে। তারপর একটা সুন্দর আসন বিছিয়ে দিয়ে বলল, নিন আপনি এখানে বসুন। বসে একটু বিশ্রাম করুণ।

—আরে বেটি—বুড়ি খুব দক্ষতার সঙ্গে বলল, আমার কি বসার সময় আছে এখন। এখন আমার নামাজ পড়ার সময়। তুই বরং আমায় একটু পানি দে। উজু সেরে আমি নামাজে বসি।

লুৎফা জল এনে দিলে বুড়ি উজু করে ঠিক মক্কা যেদিকে সেদিকে মুখ করে নামাজে বসল। দেখতে দেখতে দুপুর হল। বিকেল কাটল। সন্ধে হতে চলল। নামাজ সেড়ে বুড়ির তবু ওঠার নাম নেই। ঠিক যেমন ভক্তিবান পীরেরা নামাজ পড়ে অবিকল সেই রকম। আল্লার ধ্যানে মগ্ন!

লুৎফা এসে বুড়িকে ডাকাডাকি করে তার ধ্যান ভাঙাল। কিন্তু বুড়ি শুনলেও ঠিক উত্তর দিল না। জোর করে চুপ করে রইল। বেশ কষ্ট হলেও ভাবল; আর একটু কষ্ট করে থাকতে হবে। ওদের মনে শ্রদ্ধা জাগাতে হবে। নাহলে কাজ উদ্ধার হবে না।

লুৎফার অনেক ডাকাডাকিতে শেষ পর্যন্ত চোখ মেলল বুড়ি।

—কি রে কি বলছিস বেটি!

—বলছি এবার একটু মুখে কিছু দিয়ে নিন।

বুড়ি মোলায়েম হেসে বলল; আমাদের কি আর মুখে দেওয়ার সময় আছে রে এখন? আমার এখন উপবাসের ব্রত চলছে। খানাপিনা আমাদের এখন পোষায় না। তোদের বয়স কম। তোরা এখন খানাপিনা স্ফূর্তি করবি। আমাদের এখন আল্লাকে ডাকার সময়।

শুনে লুৎফার মাথা শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়ল। বুড়ির এই কথা

শোনার পর সে স্বামী খ্বশরুর কাছে গিয়ে বলল, মালেক এই পীর মা-কে আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকার বন্দোবস্ত করি না কেন ?
স্বামী খ্বশরু হেসে বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি পীর মার জন্যে ইতিমধ্যেই আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিয়েছি থাকার জন্যে।
সেদিন সাররাত নামাজ পড়ে আর কোরাণ পাঠ করেই কাটিয়ে দিল বুড়ি। পেটে খিদেয় মোচড় দিচ্ছে তবু ওঠার নাম নেই। একমনে শুধু কোরান পড়েই চলেছে। এল সময় ভোরের আলো ফুটে উঠলে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে উঠল বুড়ি। সঙ্গে সঙ্গে লুৎফা আর খ্বশরু ছুটে এল। বলল, এ কি পীর-মা আপনি উঠছেন যে—! যাবেন কোথায় ?
ক্লান্ত হেসে বুড়ি বলল, আমি চলি রে। আল্লা তোদের মঙ্গল করুন। তোরা যেন ভাল থাকিস।
—কিন্তু আপনি চলে যাবেন! লুৎফা কাতর হয়ে পড়ল, আমরা যে আমাদের বাড়িতে আপনাকে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য আমাদের বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে।
বুড়ি বলে, আল্লা তোদের মঙ্গল করুন। তোদের দোয়া করুন। কিন্তু আমি থাকতে পারছি না রে। আসলে এখানে এসেছি। এসে এখানকার তীর্থগুলোই সব এখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। সেগুলো দেখবো বলেই যাচ্ছি আমি। তবে তোদের কথা দিলাম মাঝেমাঝেই আসবো আমি। কিন্তু একটা কথা, যখনই আসবো তোদের ওই দরোয়ানটা যেন আমাকে বাধা না দেয় বলে দিস।

বলে লাঠিতে ঠকঠক শব্দ তুলে বুড়ি বেরিয়ে গেল। বেরিয়েই সোজা গিয়ে উঠল ওয়ালির বাড়িতে। তার সামনে।

ওয়ালি জিজ্ঞেস করল, কি চাচী খবর কি? লুৎফাকে কবে আনছো?

—খবর ভালই জনাব। নিজের চোখে দেখে এলাম তার রূপ আর গুণ। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আপনি। খলিফাকে দেবার মতো উপযুক্তই বটে। তবে আনতে একটু সময় লাগবে।

সময় লাগবে শুনে ওয়ালি প্রথমে একটু দমে গেলেও পরে বলল, ঠিক আছে। তাই এনো। কিন্তু কতদিন?

—ধরুন একমাস।

—একমাস! একটু হতাশ স্বরে কথাটা বলে ওয়ালি বলল, ঠিক আছে। একমাসের মধ্যেই এনো। কিন্তু মনে রেখো কাজ

হাসিল করা চাই। তাহলে তোমার অনেক ইনাম মিলবে। এই নাও আরও একথলে মোহর তোমাকে আগাম দিয়ে দিলাম। তোমার তো খরচ খরচা আছে।

আরও একথলে মোহর পেয়ে বুড়ি খুব খুশি। আলখাল্লার ভেতরে সেগুলো ঢুকিয়ে নিয়ে পরে নিজের বাড়িতে গেল। তারপর প্রায়ই খুশরু আর লুৎফার বাড়িতে নিয়ম করে হাজিরা দিতে লাগল।

একদিন খুশরু বাড়িতে ছিল না। বাহার সাহেবও নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে বেরিয়েছেন বাইরে। এমন সময় বুড়ি এল। এসে লুৎফার কাছে বসে নানা কথা বলতে বলতে তার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে বলল, বেটি তোকে দেখলে আমার কি যে আনন্দ হয় তা কি বলব। আবার দুঃখও হয় একটা।

বলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ি। লুৎফা কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কি দুঃখ কিসের দুঃখ পীর-মা!

বুড়ি বলল, তোর সব থেকেই একটা বাচ্চা হল না এখনো—তাই খুব ভাবছিলাম।

বুড়ির কথা শুনেই লজ্জা পেল লুৎফা। বুড়ি তখন বলল, ঠিক আছে ভাবিস না তুই বেটি। আমার সঙ্গে এখানকার এমন কয়েকজন পীরের আলাপ হয়েছে আল্লার দোয়ায় যাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। অন্ধকে তাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। আকাশে পাখির মতো ওড়েন। বন্ধ্যা নারীকে পুত্রবতী করে তোলেন। কাজেই তাঁদের কাছে গিয়ে একবার দোয়া মাঙলেই হল!

একটি সন্তানের ইচ্ছে লুৎফার মনে বহুদিন ধরেই জেগেছে।

কিন্তু মেটেনি বলে মনে মনে হতাশা এসে যাচ্ছিল। এখন বুড়ির কথায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, তাহলে আমাকে নিয়ে একদিন চলুন পীর-মা?

—আজই চল না কেন বেটি? এখুনি চল।

—আজ! এখন!

—হ্যাঁ অসুবিধে কোথায়! শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়!

লুৎফা বলল, কিন্তু এখন আমার স্বামী বাড়িতে নেই। না বলে কি করে আমি যাই বলুন। তার চেয়ে একটু পরেই তিনি ফিরবেন। তখন না হয় তাকে বলে বেরোবো?

বুড়ি বলল, সে কী বেটি! তোর স্বামী বাড়িতে নেই কিন্তু শাশুড়ি তো আছেন। তিনি তো তোর স্বামীরও গুরুজন! তাকে তো হবে। তুই বরং তার অনুমতি নিয়ে আয়।

বুড়ির কথায় লুৎফা ছুটল তার শাশুড়ির ঘরে। পেছনে পেছনে বুড়িও গেল।

লুৎফা তার শাশুড়িকে গিয়ে বলল, মা আপনার কাছে একটা ব্যাপারে অনুমতি চাইতে এসেছি। পীর মা-র সঙ্গে আমি এখানকার কয়েকজন পীরের কাছে দোয়া মাগুতে যাচ্ছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আপনার ছেলে ফিরে আসার আগেই আমি ফিরে আসবো।

সব শোনার পরে শাশুড়ি একটু ইতস্তত করে বলল, কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করে রে! বাড়ি ফিরে ছেলে তোকে না দেখলে ভীষণ বকবে।

বুড়ি পেছনেই ছিল। সে অমনি বলে উঠল, ভাল কাজে বউকে বাধা দেবেন না। মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন আপনি। আমরা যাবো

আর আসবো। দেখবেন আপনার ছেলে ফেরার আগেই আমরা ফিরে আসবো। কথা দিচ্ছি।
ইচ্ছে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত বুড়ির কথায় একরকম বাধ্য হয়েই অনুমতি দিল লুৎফার শাশুড়ি। মুখে বলল, তাহলে যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো বাছা।

বুড়ি লুৎফাকে নিয়ে বেরোল। খানিকটা গিয়ে একটা বড় বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুৎফাকে বসিয়ে রেখে জানাল, দাঁড়া আমি আগে দেখি পীর কি করছেন এখন। তারপর তোকে এসে মসজিদে নিয়ে যাবো।
কিন্তু সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়ি সোজা ওয়ালির কাছে খবরটা দিতে ছুটল। খবর পেয়ে ওয়ালি ছুটে এল সে বাড়িতে। আসলে সে বাড়িটাও ছিল ওয়ালির নিজের। বুড়ির কাছে শুনে যখন গিয়ে সেখানে ঢুকল তখন তার চোখ বড় হয়ে গেল লুৎফাকে। এত রূপ! এত সুন্দরী লুৎফা! বণিক বাহারের পুত্রবধূ!
এদিকে বুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পরে থেকেই ছটফট করতে শুরু করেছিল লুৎফা। এত সময় চলে যাচ্ছে অথচ আসছি বলে সেই

যে চলে গেল এখনও ফেরার নাম নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে বসে থেকে থেকে যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে তখুনি পায়ের শব্দে চমকে উঠল। চোখের সামনে আচমকা এক পর পুরুষকে দেখে লুৎফার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝল সে শয়তানের খপ্পরে পড়েছে। ওই বুড়িই নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। আসলে দরোয়ান ঠিকই ধরেছিল। বুড়িকে ঠিকই চিনেছিল। কেন যে তখন সবাই তারা দরোয়ানের কথা শুনল না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল লুৎফা। এদিকে ওদিকে দৌড়ে পালাবার চেষ্টাও করল। কিন্তু যাবে কোনদিক দিয়ে। চার দিকের দরজা জানলা বন্ধ। তাছাড়া কেউ নেই কোথাও! শুধু ওই যমদূতের মতো লোকটা ছাড়া। ওড়নার ভেতরে চোখের জল পড়তে লাগল লুৎফার।

ওয়ালি কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াল না। লুৎফাকে দেখেই দরজা বন্ধ করে এসে পাশের ঘরে ঢুকে চিঠি লিখল দামাস্কাসের খলিফা ইবন মারবণকে। তারপর তার প্রহরী সর্দারকে ডেকে সেই চিঠিটা দিয়ে বলল, নাও এই চিঠির সঙ্গে একজন বাঁদী পাঠাচ্ছি। সোজা গিয়ে দামাস্কাসে উঠবে। গিয়ে দেবে খলিফা মারবণের হাতে। এই বাঁদী তাঁকে আমার উপহার।

এরপর ওয়ালির লোকজন লুৎফাকে সেই ঘর থেকে বার করে একটা তাঞ্জামে চড়িয়ে খুব দ্রুতগামী একটা উটের পিঠে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালির প্রহরী সর্দার কয়েকজন প্রহরী আর বান্দা নিয়ে রওনা হয়ে গেল দামাস্কাস। লুৎফা তখন তাঞ্জামে বসে ওড়নায় মুখ ঢেকে শুধু চোখের জল ফেলছে। কতবার সবাইকে কত অনুনয়-অনুরোধ করছে। কতবার জিজ্ঞেস করছে।

কিন্তু কারো মুখেই কোনো উত্তর নেই। আর এভাবেই যেতে যেতে এক সময় তাঁরা দামাস্কাস পেঁছে গেল।

এদিকে বণিক বাহারের বাড়িতে ততক্ষণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খুশরু সন্ধ্যের দিকে বাড়িতে ফিরে অনেক খোঁজ করেও যখন লুৎফাকে পেল না তখুনি সে তার মায়ের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল মা তার শোকে কাতর। চমকে উঠে খুশরু জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা? লুৎফা কোথায়?

খুশরুর কথায় মা ডুকরে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদেই বলল, কি বলবো বাবা—আজ সকালে তুই বেরোবার পরেই সেই বুড়ি ফকিরণী এসে হাজির। এ কথা সেকথার পরে বুড়ি লুৎফাকে এখানকার কোন পীরের কাছে দোয়া মাগতে গেল। তুই বাড়িতে নেই, আমার অনুমতি দেওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বুড়ি এমন করে বলতে লাগল যে না দিয়ে পারলাম না। বলল, এই এসে পড়ছি। অথচ এখনও ফেরার নাম নেই। ওই বুড়িই আসলে সর্বনাশের মূল। ও যেদিন থেকে বাড়িতে ঢুকেছে সেদিন থেকেই আমার শান্তি নেই। ওই বুড়ো দারোয়ান, যে তোদের কোলেপিঠে মানুষ করেছিল সে ঠিকই চিনেছিল বুড়িকে। তাই বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। আহ্ আল্লা। আল্লা তুমিই বল। তুমিই বল এখন কি করা যায়। বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল খুশরুর মা।

খুশরু বলল, দাঁড়াও তো। অত কেঁদো না। আগে বল ঠিক কখন বেরিয়েছে ওরা?

—তুই বেরোবার একটু পরেই।

খুশরু বলল, উফ্। এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি যে কেন ওকে

ওই বুড়ি ফকিরণীর সঙ্গে বেরোতে দিলে মা! ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি ওয়ালির কাছে। দেখি তাঁকে বলে উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

বলতে বলতে খুশরু বেরিয়ে গেল।

ওয়ালির কাছে গিয়ে বলতেই ওয়ালি যেন কিছুই জানে না এমনি ভাণ করে বলল, তাই নাকি! তোমার বিবিকে পাচ্ছো না। ঠিক আছে। বাহার সাহেবের বেটা তুমি। তোমার জন্য তো কিছু করতেই হবে আমাকে। ঠিক আছে 'তুমি শহরের কোতোয়াল সর্দারের কাছে গিয়ে আমার নাম করে বল যে আমি পাঠিয়েছি তোমাকে। তোমার বিবিকে খোঁজার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে সে। কিন্তু কোতোয়াল সর্দার তার কথা মোটেই আমল দিল না। খুশরু তখন রেগে গিয়ে ওয়ালির কাছে ফিরে এসে সব জানাল। ওয়ালি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল সর্দারকে ডেকে পাঠাল। পাঠিয়ে তাকে খুব করে বকে জানাল, যে ভাবেই হোক বাহার সাহেবের পুত্রবধূকে খুঁজে বার করতে। বলল বটে তবে খুশরুর আড়ালে সর্দারকে চোখ টিপে ইশারা করল। অর্থাৎ কিছুই করতে হবে না তাকে। খুশরুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এসব বলছে।

তাই খুশরু তাকাতেই ওয়ালি বলল, তুমি যাও বেটা। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি এখুনি চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা নিশ্চয়ই তোমার বিবির খবর এনে দেবে।

ওয়ালির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিন থেকে খুশরু কিন্তু চুপচাপ বসে থাকল না। সারারাত শহরের ভেতরে চারদিকে খোঁজ করতে লাগল। সারারাত ধরে খোঁজে। সকালের দিকে বাড়িতে ফিরে

আসে। মাত্র ক'দিনেই শরীর ভেঙে পড়ল। ফলে একদিন সকালে বাড়িতে ফিরে আর উঠতে পারল না। বিছানায় শুয়েই রইল। তখন তার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। নড়বার শক্তি নেই। বণিক বাহার বাড়িতে ফিরে সব শুনে তো অবাক। শোকে আর ছেলের অবস্থা দেখে প্রাণ তার ছটফট করে উঠল। কিন্তু কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এদিকে ছেলের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়ে উঠল। বাহার সাহেব শহরে যত নামী-দামী হাকিম ছিলেন সবাইকেই ডেকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। কিন্তু সবারই এক কথা—স্ত্রীকে না পেলে আর ভাল হবে না ও। এ অসুখ সারবার নয়।

এই সময় ভাগ্যচক্রে এক পার্শী শেখ সেই শহরে এসে হাজির। সবাই বলাবলি করল, এত বড় গণৎকার, এত বড় হাকিম, রসায়নবিদ ও জ্যোতির্বিদ্ আর কখনো দেখা যায়নি এই শহরে। কথাটা বাহার সাহেবের কানেও গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন তাঁর কাছে। মহাসমাদর করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনে তাঁর ছেলেকে দেখালেন।

খুশরুকে দেখেই গণৎকার হাকিম বুঝলেন ওর অবস্হার কথা। একটু পরে তাই বললেন বাহার সাহেবকে, দেখুন জনাব, আপনার ছেলের এ অসুখ শরীরের নয়। মনের। দিলের অসুখ। আমার মনে হল দিল ঠিক হলেই এই অসুখ কমবে।

—ঠিক, ঠিক জনাব। ঠিকই ধরেছেন। বাহার সাহেব উত্তর দিলেন।

গণৎকার-হাকিম বলে চললেন, কোনো এক বিশেষ প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার জন্যই ওর এই অবস্হা। বোধহয় নিরুদ্দেশ

হয়েছে সে। আচ্ছা দাঁড়ান আমি এক্ষুনি গুণে বলে দিচ্ছি কোথায় রয়েছে ওর সেই প্রিয়জন।

বলে শেখ মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা কৌটোর ভেতর থেকে বালি বার করে বিছিয়ে দিলেন। তারপর তার ওপর রাখলেন পাঁচটা সাদা আর তিনটে কালো নুড়ি। দুটো কাঠি আর একটা বাঘের নখ। এরপর কি সব বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলেন। সব শেষ হলে হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন, জনাব, এই ছেলে তার বিবিকে হারিয়েছে। সেই বিবি আছে দামাস্কাসে। খলিফার হারেমে। তবে সেও সুস্থ নয়। এই তরুণকে হারিয়ে তার মনের অবস্থাও এমনি।

গণৎকার-হাকিমের কথা শুনে বাহার সাহেব বললেন, তাহলে কি করা যায় জনাব? এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই আমরা। যদি আমার পুত্রবধূ ও ছেলেকে সুস্থ করে তাদের মধ্যে আবার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন তবে আপনি যা চান আমি তাই দেবো।

পার্শী শেখ বললেন, ব্যস্ত হবেন না জনাব। আমি এদের দুজনকে আবার এক জায়গায় নিয়ে আসবো। আপনি চিন্তা করবেন না। আপাতত আপনি এক কাজ করুন। আমাকে চার হাজার দিনার দিন। দামাস্কাসে যাওয়ার খরচ আছে তো!

বণিক বাহার সঙ্গে সঙ্গে গণৎকারের হাতে পাঁচ হাজার দিনার তুলে দিয়ে বললেন, এই নিন জনাব—এই যে।

কিন্তু শেখ তা থেকে চার হাজার তুলে নিয়ে বাহার সাহেবকে জানালেন, এর বেশি আর দরকার নেই জনাব। এতেই আমার হয়ে যাবে। আমি আজই রওনা হতাম। কিন্তু আমার একা

গেলে চলবে না। আপনার ছেলেকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। অথচ একটু সুস্থ না হলে তাকে নিই কি করে!
বাহার সাহেব মাথা নাড়লেন।—হ্যাঁ ঠিক। ঠিক বলেছেন জনাব। তাহলে ছেলে একটু সুস্থ হোক।
—হ্যাঁ একটু সুস্থ হলেই দিনকয়েক পরে এসে আমি ওকে নিয়ে যাবো। বলে খুশরুকে দেখে সব বুঝিয়ে দামাস্কাস রওনা হওয়ার জন্য আয়োজন করতে বেরিয়ে গেলেন।
গণৎকার বেরিয়ে গেলে সব শুনে খুশরু অনেকদিন পরে উঠে বসল। তারপর লুৎফাকে পাওয়া যাবে এই আশ্বাসে খাওয়া-দাওয়া করে দিন কয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। এদিকে সব ব্যবস্থা সেরে গণৎকার শেখ এসে খুশরুকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে খুব খুশি হলেন। বাহার সাহেব ইতিমধ্যেই ছেলের জন্য কয়েকটা উট, দামী কিছু জিনিসপত্র ও রঙিন পশমের কিছু কাপড়ের বাণ্ডিল কিনে উটের পিঠে সাজিয়ে দিলেন। আর একটা উট সাজিয়ে সেটা রাখলেন ছেলে খুশরুর জন্য।
নির্দিষ্ট দিনে শেখ খুশরুকে নিয়ে দামাস্কাসের পথে রওয়ানা হলেন। খুশরু দেখতে একেই অসাধারণ রূপবান, তার ওপর কয়েকদিন অসুস্থতার পরে লুৎফাকে পাওয়া যাবে জেনে যখন সুস্থ হয়ে উঠল তখন তার রূপ যেন আরও ফেটে পড়ল। তাছাড়া তার কথাবার্তা আর ব্যবহারে শেখ এত খুশি হয়েছিলেন যে নিজের ছেলের মতো তাকে ভালবেসে ফেললেন।
দামাস্কাসে পেঁৗছে শেখ বললেন, দেখ বেটা এবার আমি যা বলবো তোকে তুই তাই করবি। ব্যস তাহলে আর ভাবতে হবে না তোকে।

দুদিন পরে শেখ খুঁজে খুঁজে শহরের বড় বাজারে গিয়ে একটা সুন্দর ঘর ভাড়া নিলেন। তারপর শুরু হল সেই ঘর সাজানো। ভেতরে অনেকগুলো তাক ছিল। সেগুলো সব মখমল দিয়ে মুড়ে তাতে কাঁচ বসালেন আর সোনা-রুপার পাত্রে রাখলেন সব রকমারী ওষুধ, কোনোটা তরল, কোনোটা নিরেট ঘন, কোনোটা গুঁড়ো, কোনোটা বা আবার শুধু শুকনো লতাপাতা-গাছ-গাছড়ার ডাল। এ সবের পাশে রাখলেন একটা হামানদিস্তা। খাঁটি সোনার একটা নিক্তি রাখলেন সবার ওপরের তাকে। ওষুধের পাত্রগুলো এমন ঝকঝকে যে সামনে দাঁড়ালে মুখ দেখা যায়।

এরপর একদিন খুব ঘটা করে দোকান খোলা হল। দেখতে দেখতে খুব ভিড় হতে লাগল রোজ। যে রোগী আসে সেই ভালো হয়ে ফিরে যায়। কথায় কথায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ফলে রোগী ছাড়াও অনেকে এসে শুধু দেখার জন্য ভিড় করলো শেখের দরবারে। এমন কি খলিফা ও তার বোন দাহিয়ার কানেও গেল এই পার্শী শেখের কথা।

একদিন শেখ ও খুশরু বসে আছে দাওয়াখানায়। শেখের নির্দেশ মতো একটু পরেই যখন খুশরু ওষুধ বানাচ্ছে, ঠিক তখনই একজন বুড়ি লাল কিংখাপে আঁটা এক জিনের ওপরে বসে একটা গাধায় চড়ে সেখানে এল।

বুড়িকে দেখেই শেখ উঠে গিয়ে তাকে সাদরে নিচে নামতে সাহায্য করল। বুড়ি একটু দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বলল, তুমি নিশ্চয়ই সেই পার্শী হাকিম যাঁর কথা আমরা পথেঘাটে রোজই শুনি?

শেখ মাথা নাড়াতেই জানাল, দেখ হাকিম—আমি এসেছি এখানকার মহামান্য খলিফার বোন দাহিয়ার কাছ থেকে। খলিফা মাররনের

হারেমে নতুন একজন কুমারী বাঁদী এসেছে। এই বাঁদীর মতো এমন অসামান্য রূপসী খলিফার হারেমে আর কোনোদিন আসেনি। কিন্তু মুশকিল হল বেশ কিছুদিন হল এই বাঁদী এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, খাওয়া নেই—ঘুম নেই। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কত হাকিম যে কত ওষুধ দিয়েছে কিছুতেই কিছু হয়নি। বাঁদীর অবস্থা বরং দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেজন্য মহামান্য খলিফার বোন দাহিয়া আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। তা আপনি কি তাকে একবার দেখবেন না লক্ষণ শুনেই ওষুধ দেবেন ?

শেখ একটু ভেবে বললেন, না আপাতত তাকে দেখার আর কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না। তবে আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর ঠিক ঠিক দেবেন।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বুড়ির ততক্ষণে খুব ভাল লেগেছে শেখকে। তাছাড়া তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তিনি খুশরুর দিকেও মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলেন। এমন সুন্দর এক রূপবান তরুণকে এই হাকিমের সঙ্গে কাজ করতে দেখে মনে তার অনেক প্রশ্ন জেগেছিল। হাকিমকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা হাকিম সাহেব, ওই তরুণ কি আপনার বেটা না বান্দা ?

—আপনার বান্দা আর আমার বেটা।

উত্তরের ভঙ্গীমায় আর সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বুড়ির আরও ভাল লাগল শেখকে। এবার শেখ বললেন বুড়িকে, আচ্ছা এবার আপনার বাঁদীর প্রসঙ্গে আসি। দেখুন আল্লার কৃপায় আমি কিছু কিছু জ্যোতিষী চর্চাও করি। কাজেই আপনি বসুন। আমি একটু

পরেই গুণে বলে দিচ্ছি আপনার বাঁদীর কী হয়েছে!

খানিক পরে একটু বালি নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে তার ওপরে আঁকিবুকি কেটে একটু পরেই শেখ বললেন, দেখুন বাঁদীর যা অসুখ হয়েছে তার নাম বুক ধড়ফড়ানি।

—হ্যাঁ ঠিক। ঠিকই বলেছেন হাকিম সাহেব। বুড়ি অবাক চোখে আনন্দে বলে উঠল, ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমরা সবাই লক্ষ্য করছি রোজ তার বুক ধপাস ধপাস করে ওঠানামা করে। কিন্তু ওষুধ কিছু কি দেবেন আমার কাছে?

শেখ বললেন, হ্যাঁ দেবো তো নিশ্চয়ই। তবে আমার একটা কথা আছে?

—হ্যাঁ বলুন হাকিম সাহেব?

—বলছিলাম যে-বাঁদীর অসুখ তার নামটা জানাতে হবে। তাছাড়া সে কোথায় থাকত তাও জানা দরকার। কেননা আপনি তো জানেন এক এক দেশের আবহাওয়া এক এক রকম। কোনো দেশের ভারী। কোনো দেশের পাতলা। কাজেই সেসব না জানলে ওষুধের অনুমান ঠিক হবে না। আর বয়সটাও জানতে হবে। বয়স না জানালে ওষুধ দেব কি করে? কারণ বেশি বয়স আর অল্প বয়সের ওষুধের অনুমান তো আলাদা।

বুড়ি বলল, তাই তো। সে কথা তো ঠিকই। না-না আপনি ঠিক বলেছেন। শুনুন এখন যা বলি। ওই বাঁদীর নাম হল লুৎফা—।

লুৎফা নামটা শুনেই খুশরু আর শেখ দুজনেই চমকে উঠলেন। শেখ বুঝলেন, তাহলে ঠিক মতোই এগিয়েছেন তাঁরা। এখন কথায় বাকি সব কিছু বার করে নিলে হয়।

বুড়ি ততক্ষণে বলে চলেছে, আর বয়সের কথা জিজ্ঞেস করছেন। বয়স তার খুবই কম। সবে সতেরো। আর—

—আর—!

সব শেষে দেশের নামটা বলতেই শেখ বুঝলেন, তাঁর সব গণনা ঠিক ঠিকই মিলেছে। তাহলে বাহার সাহেবের পুত্রবধূ লুৎফা এখানকার খলিফার হারেমেই এসেছে। ঠিক আছে, এবার দেখা যাক্।

বুড়ির কাছ থেকে সব শুনে শেখ এবার খুশরুকে বলল, বেটা কেতাবের সাত নম্বর ওষুধটা তৈরী কর তো ?

খুশরু এতক্ষণ এক মনে শুনছিল বুড়ির কথাগুলো। শেখ ওষুধের কথা বলতেই তার চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তৈরী করতে বসে গেল সে। সব ওষুধ তৈরী করে ওষুধগুলোকে একটা কাগজের মোড়কে মুড়ে একটা কৌটোর ভেতরে চালান করে দিল। আসলে যে কাগজের মোড়কে ওষুধগুলো মুড়ে দিয়েছিল তা ছিল লুৎফাকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিঠি। সেই চিঠি সহ ওষুধের পুরিয়াগুলো কৌটোর ভেতরে পুরে কৌটোটা সীল করে দিল। তার ওপরে এবার নিজের দেশের প্রচলিত ভাষায় নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিল। যে ভাষা একমাত্র লুৎফা ছাড়া এখানকার আর কেউ বুঝবে না।

ওষুধ নিয়ে বুড়ি চলে গেল একটু পরে। সোজা গিয়ে দাঁড়াল লুৎফার ঘরে। লুৎফা তখন যথারীতি মন খারাপ করে শুয়েছিল। বুড়ি গিয়ে তার হাতে ওষুধের কৌটোটা দিয়ে বলল, নাও, দেখে এলাম সেই বিদেশী হাকিমকে। আর যে ওষুধ তৈরী করে দিল সে এক তরুণ। তার রূপ দেখে তোমার মাথা

খারাপ হয়ে যাবে। যেমন রঙ তেমনি দেখতে। তার ওপর আবার ঠোঁটের বাঁদিকে থুতনির কাছাকাছি একটা তিল আছে। হাসলে টোল খায়। কাজেই সেই তরুণ যখন ওষুধ তৈরী করেছে তখন আমার তো মনে হয় এই ওষুধেই তোমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। নাও খেয়ে ফেল দেখি একটা—

কৌটোটা হতে নিয়েই এতক্ষণ বুড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল লুৎফা। এখন সেই তরুণের রূপের বর্ণনা শুনে সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার স্বামী খুশরুর কথা কিন্তু সেসব কথা ভুলে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে এবার বুড়িকে খুশি করার জন্য সীলটা খুলে ফেলল। কিন্তু সীল খুলতে গিয়েই অবাক। কি যেন লেখা রয়েছে তাতে। আর ভাষাটাও যেন ওর নিজের দেশের মতো।

সামনে নিয়ে কৌটোটা ভাল করে দেখতেই বুঝল, সত্যিই ওর দেশের ভাষা। তার স্বামী খুশরুর নাম ঠিকানা লেখা। দুরু দুরু বুকে কৌটোটা খুলে ওষুধগুলো বার করে নিল সে। আর বার করতে গিয়েই দেখল একটা চিঠি। চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেই বুঝল এই তরুণ তার কেউ নয়—তার স্বামী খুশরু অনেক খোঁজ-খবর করে এখানে এসে পেঁছেছে। বুড়িকে দেখিয়ে মুহূর্তেই ওষুধগুলো চালান করে দিল লুৎফা। তারপর বুড়িকে বলল, বুড়ি-মা মনে হচ্ছে ওই তরুণের ওষুধে কাজ হবে। কেননা এরই মধ্যে আমার বেশ ভাল লাগতে শুরু করেছে। আর যেন বেশ খিদেও পাচ্ছে। বুড়ি-মা আমার জন্য কিছু খাবার আনতে পারো?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি এখুনি নিয়ে আসছি। এ তো ভাল

কথা রে! বলতে বলতে বুড়ি ছুটল খাবারের খোঁজে।
কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু খাবার এনে লুৎফাকে খাওয়াতেই লুৎফা এবার আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠল। দেখে বুড়ি আর দাঁড়াল না। খবরটা দিতে ছুটল মহামান্য খলিফার বোন দাহিয়ার কাছে। দাহিয়া খরব পেয়েই ছুটল খালিফাকে খবর দিতে।
খবর পেয়ে খলিফা মারবন সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার দিনারের একটা মোহরের থলি বুড়ির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সেই হাকিম সাহেবকে দিয়ে আসতে।
খলিফার কাছ থেকে মোহরের থলে নিয়ে বুড়ি একবার দেখা করতে এল লুৎফার কাছে।
লুৎফা বলল, আমিও কিছু উপহার দিতে চাই ওই তরুণকে। একটা কৌটো বুড়ির হাতে তুলে দিল লুৎফা। আসলে কৌটোর ভেতরে ছিল তার স্বামী খুশরুকে লেখা একটা চিঠি। চিঠিতে সে জানাল, তার অবস্থা। কিভাবে বুড়ি পীর-মা তাকে চুরি করে তাদের ওখানকার শাসনকর্তা ওয়ালির কাছে নিয়ে গেছে। ওয়ালি তারপর কিভাবে খলিফা মারবনের কাছে তাকে ভেট পাঠিয়েছে। চিঠির শেষে প্রায় কান্নার সুর। লুৎফা জানিয়েছে, খুশরু যেন তাকে অবশ্যই এই নরক থেকে উদ্ধার করে। সে আর পারছে না।
চিঠি পেয়ে খুশরু বুড়ির সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।
তরুণ ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যেতেই বুড়ি অবাক। তাই তো! কি হল এমন! উপহার পেয়ে ছেলেটি কেন অজ্ঞান হল। শেখ কথাটা

খুলে বললেন বুড়িকে। জানালেন, বুড়ি যেন কাউকে না বলে। বললেন এই তরুণ খুশরু তার বিবিকে জীবনে খুঁজে পাবে না। তাদের মিলন আর সম্ভব হবে না। এখন সম্ভব হতে পারে যদি বুড়ি তাদের সাহায্য করে।

বুড়ি তখন হাকিমকে কথা দিল, যে ভাবেই হোক ওদের দুজনের মধ্যে আবার মিলন ঘটিয়ে দেবেই।

সেদিন হারেমে গিয়ে লুৎফাকেও জানাল কথাটা। লুৎফা শুনে প্রথমে চমকে উঠল। তারপরেই যখন বুঝল বুড়ি কথাটা কাউকে বলবে না—বরং তার উপকার করতেই এসেছে তখন সেও সব বুঝিয়ে বলল বুড়িকে।

একদিন বুড়ি তরুণকে মেয়ে সাজিয়ে ওড়নায় ঢেকে নিয়ে এল হারেমে। লুৎফার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু অনেক দিন পরে লুৎফার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে হারেমে ঢুকে ধরা পড়ে গেল খুশরু। ধরা পড়ল একেবারে খলিফার বোন দাহিয়ার কাছে।

ধরা পড়ে দাহিয়ার পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল খুশরু। সব কথা খুলে বলে তারপর জানাল, লুৎফাকে যেন তার হাতে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বলতে বলতে এরপর এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেল খুশরু। দেখে মনে মনে খুব কষ্ট পেল দাহিয়া। খুশরুর জ্ঞান ফিরিয়ে তাকে লুৎফার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিল।

এরপর অনেক কৌশল করে খলিফা মারবনকে অনেক করে বুঝিয়ে তবেই লুৎফাকে খুশরুর হাতে আবার ফিরিয়ে দিল দাহিয়া। শুধু তাই নয়—এর কিছু দিনের পরেই খলিফার আদেশ গেল—ওয়ালির জায়গায় এবার থেকে নতুন খলিফা হল খুশরুর বাহার সাহেব। আর ওয়ালিকে দেওয়া হল কঠিন শাস্তি।

স-মা-প্ত